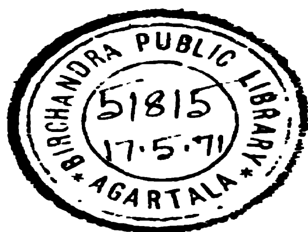
দুহাতে মোহনা ছুঁয়ে

আশুতোষ গোস্বামী



বিচিত্রা প্রকাশনী
৭, নবীনকুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশ
জন্মাষ্টমী—১৩৬৭

প্রচ্ছদ পট
অরুণ গুপ্ত

প্রকাশক :
সরোজ চট্টোপাধ্যায়

তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

মুদ্রণ
শরৎ গুড়ে
নারায়ণী প্রেস
২৬সি, কালিদাস সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

সব কালের সব কবিকে—

কবিতার ব্যাখ্যা বা ভাষ্য রচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা যা একান্তভাবেই স্বপ্রকাশ, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ব্যাখ্যা করে আর যাই হোক তার মূল স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। আমার বইয়ের শুরুতে কবিতা বিষয়ক দু'চারটে কথা লিখতে লিখতে এইসব কথাই মনে পড়লো। এই বইতে নানা জাতের নানা রীতির কবিতা আছে। এবং প্রায় সব কবিতার ভিতরেই আমি, খুব ভয়ে ভয়ে জানাই আমার কণ্ঠস্বর বজায় রাখতে চেয়েছি। অধুনা নানা কোলাহলের উচ্চনাদে কবিদের আপন আপন স্বর চাপা পড়ে গিয়েছে। পাঠক যদি এই বইতে শুধুমাত্র আমার নিজের কণ্ঠস্বরটি শুনতে পান, তাহলে কৃতার্থ বোধ করবো।

এই গ্রন্থের কবিতাগুলির নির্বাচন করেছেন পরম সুহৃদ অধ্যাপক শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় (আনন্দচন্দ্র কলেজ, জলপাইগুড়ি)। বন্ধু-প্রতিম অধ্যাপক শ্রীসুধীরকুমার বিশ্বাস মহাশয় (শ্রীরামকৃষ্ণ বি. টি. কলেজ, দার্জিলিং) প্রুফ দেখে দিয়েছেন এবং এতে তাঁর মনোনীত আরো গোটাকয়েক কবিতা যোগ করেছেন। এঁদের সর্বতোমুখী অকৃত্রিম সাহায্যের জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

সব শেষে গ্রন্থটি প্রকাশ করে শ্রীসরোজ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে অশেষ ঋণে বেঁধেছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

জন্মাষ্টমী,
১৩৬৭

শ্রীআশুতোষ গোস্বামী

সূচীপত্র

সোনার হরিণ

চৈতী হাওয়ায় অপরাহ্নের ক্ষণ যৌবন জ্বলে,
কালের বুকে লুটিয়ে বালা বৃথাই মাথা ঠোকে।
ঘুম-দুপুরের জানলা দিয়ে শব্দ এসে ঢোকে—
ঢিল দিল কি ঝিলের জলে কপাটে টোকালো,
সোনার হরিণ দূর দিগন্তে গান কি শোনালো,
হাতছানি দেয় মায়াবিনী মৃদু মধুর বোলে।

নিঝুম রাত, রহস্যময় পাতাব ফিসফাসে,
কিসের মৃদু খসখসানি আসে ভেসে হাওয়ার মুঠিতে,
অধরা সে সোনার হরিণ এলো কি আজ জীর্ণ কুঠিতে
অন্ধ আবেগ গোপনে বয়ে বাইরে এসে দাঁড়াই,
ঘুম-অচেতন আবছা আলোয় মনের হাত বাড়াই—
স্বর্ণ-চাঁপার সোনালী শরীর বাঁধবো নিপুণ পাশে।

কেউ কোথা নাই,—চোখ মিটমিট তারারা শুধু বলে,
"অমন করে ডেকো না তাকে আঘাত পাবে পাছে"।
শুক্‌নো পাতা ঝরিয়ে দিয়ে দোলন লাগা গাছে
বাতুল বাতাস ফিরে চলে সাত সমুদ্র পারে,—
অজানা কোন আকর্ষণের ডাকে বারে বারে।
নীরব ব্যথায় শূন্য খাঁচা বাঁশের বাঁকে দোলে।

* * *

মৃত্যু-চড়া বাসা বাঁধে মজা নদীর পাড়ে
আশাহত শোকের দীপ আথিবিথি জ্বলে।

নিথর নদী আঁধার বুকে ভাসে আকাশ তলে,
সোনার হরিণ এলো না তবু রাত্রির আশ্বাসে।
মৃত্যু বসে প্রহর গোনে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে।
সহসা এসে উষা হাসে ঝিলমিলিয়ে ঘরে
সোনার হরিণ সমর্পিত কখন অগোচরে।

বোধে যার চিহ্ন পড়ে

কে যেন ডাক্‌লো আমায়
এই সন্ধ্যার প্রান্তর ছায়ায়
অবসন্ন দিনের আলোকে,
কে যেন বললো—'এসো,
এই নিভৃত অবকাশে
তুমি আমি এক হয়ে যাই'।

কেউ কোথা নাই—শুধু ঝিঁঝিঁদের ঐকতান
হরিৎ গঙ্গাফড়িং ঘাসেদের শীষে
স্থির কম্পমান।
সুদূরে উড়ে যেতে যেতে পাখীরা
কলকণ্ঠে ডাকে,—কাকে,
ঐ শ্যামলীন পাহাড়ের বাঁকে ?
কেউ কোথা নাই,
—তবু কে যেন বললো—'এসো,
তুমি আমি এক হয়ে যাই'।

তন্দ্রাহত বাতাস ধায়
কোন পুষ্পিত সুগন্ধ আশায়

কোন অলকায়,
কী সে অলৌকিক গানে, অপার্থিব টানে।
স্বপ্ননীল নদী প্রদোষের আধো অন্ধকারে
কুলুকুলু—বনানীর পথে
দক্ষিণের পানে—কোন সমুদ্র সন্ধানে।

গাছেরা ঊর্ধ্বমুখী, প্রার্থনারত
গগন মন্দিরে,—আমি শুধু স্তব্ধ নিশ্চল ;
সন্ধ্যার অন্ধকার প্রান্তরের পথে
ফিরে ফিরে চাই—
কে যেন ডাক্‌লো আমায়
'এসো, তুমি আমি এক হয়ে যাই'।

মানুষ জন্ম জন্ম ধরে

(১)

এই বন যে আমার মনকে মোহমুগ্ধ করে
এই নদী যা আমার অতীতের মধুময় স্মৃতি
রোমন্থনের এক অপূর্ব সূর্য-বলয়
এঁকে চলে ; আমার যৌবনের রক্তিম আরতি
এক কল্পসৌধ,—স্বর্গের দিকে মাথা তোলে,
—এরা প্রত্যেকেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন বোধের স্বর।
অথচ এই নদী, বন, যৌবন অদৃশ্য কোনও
অমোঘ আশ্চর্য নিয়মে নিয়তির মতো
আদিষ্ট কোন কেন্দ্রবিন্দুতে এসে মেলে।
সংলুপ্তির সুবিশাল মৃত্তিকা গর্ভের আঁধারে
যে অন্তে লীন হয়,—ফের হয় সুরু সহোদর সাথে
সূর্যের ঔরসে—নব বর্ণালীতে, নূতন আঙ্গিকে
ভিন্ন সমাচারে।

(২)

পাখী, ফুল, কিশলয় সৃষ্টির প্রত্যুষে
প্রথমাগতা,—মানুষ এসেছে পৃথিবীতে
একদা এক আশ্রিতের মতো,—তারপর বীর্যবত্তা
আপন প্রতিভার বলে দিগ্বিজয়ী হলো।
পাখী, ফুল, কিশলয় প্রকৃতির পরিহাসে
মানুষ-ঈশ্বর আশ্রিত, শৃঙ্খলিত দাসের সামিল।
তথাপি মানব বার বার জীবনের যাত্রাপথে
ক্ষতবিক্ষত, রিক্ত, তিক্ত ঊষর সংগ্রামে,
—নতজানু তাদেরই পায়ের কাছে, প্রণত ভিক্ষায়
এক কণা সুষমার কৃপা প্রার্থী হয়ে।

(৩)

ক্ষুধার তরলধারা,—ধমনীতে গলে
রক্তে আগুন জ্বলে—
যৌন আর জঠরের প্রশস্ত সীমায়।
শোণিতের শোধন চলে
চেতনার দিব্য-রসাধারে,
গুঞ্জরে মানব মন
আত্মমুগ্ধ অমৃত-বিভায়
জ্যোতির্ময় মহাকাশ তলে।

* * *

তথাপি সে ভস্মীভূত,—সেই হোমানলে,
উই কিংবা পিঁপড়ের রুপালী পাখায়
যেখানে,—ক্ষুধার আগুন
রক্ত হয়ে জ্বলে,
মাংসের 'সমিধ' স্তূপে,—মজ্জার 'হবিতে'
ধমনীর গুপ্ত-কক্ষতলে।

(৪)

মানুষ জন্ম জন্ম ধরে তাদের সন্তানদের
দিয়ে যায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঈর্ষাকাতরতা
তবু সুপ্ত রাখে অশোধিত রক্তের ভিতরে
ক্ষীণ এক আকাঙ্ক্ষার কণা।
প্রতিবার ভাবে তাদের পরবর্তীরা সব হবে দেবদূতঃ
তারাও তারপর বিধাতার অব্যর্থ পরিহাস মেনে
একদল দেবপশু হয়ে, কোনমতে—কাতরে কাতরে
জীবনটা টেনে, পূর্বজের মতোই ব্যর্থতায় মরে,—
শুধু রেখে যায় বুনে, সোনালী স্বপ্নের বীজ গর্ভের গভীরে
হয়তো দৈবাৎ তা' হতে কোথাও কেউ স্বর্গীয় ফুল হয়ে ফোটে,
আর সব জন্ম-স্বত্বে, পৃথিবীর মাটির মহিমায়
ঘেঁটুবনে বংশ বৃদ্ধি করে।

শান্তির অমৃত-সন্ধানে

ঢং ঢং ঢং 'হসপিটালের' পেটাঘড়িতে রাত আটটা বাজে,
চারদিক সচকিত করে 'অ্যাম্বুলেন্স' আসে।
তারি ভিতরে চালানি-ছাগলের মতো মুমূর্ষের ভিড়
আশেপাশের লোকেরা জমে কৌতূহলী-সন্ত্রাসে!

'স্টেচারে' রক্ষিত রোগী, অর্ধমৃত, মৃতও বলা চলে
লালে লাল রক্তাপ্লুত দেহ,—যেন এখনি খেলেছে হোলি ;
অথচ জানি চা-বাগিচার তাজা গুলিতে ঝাজরা পাঁজর,
মাথার খুলি,—বাঁচার দাবির জবাব,—অপঘাতের বলি।

'ডাক্তারের' ব্যস্ততা নাই, অভ্যস্ত জীবনে, --
এ রকম হাজারো রোগী ঘেঁটে ঘেঁটে, পাথর-প্রাণ

তবু কর্ত্তব্য-কঠোর হাতে তুলে নেয় দায়িত্বের ভার।
যান্ত্রিক-আচরণের পিছনে কিন্তু ভয়ার্ত জান,
পরিত্রাণ-পিয়াসী ত্রাণকর্তা, যেহেতু লোকের চোখে
উত্তেজনা জ্বলে।

ঢং ঢং ঢং ঘণ্টাঘড়ি দশটার সময় জানায়।
'বল হরি হরি বল' কে যেন গেল চলে জন্মের মতো ;
এরি মধ্যে সর্বভারতীয় সমাচার—ঘোষকের কণ্ঠে
এ দিনের সবিশেষ খবর,—"বন্যা-বিধ্বস্ত বর্ধমান,
মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ—নিহতের সংখ্যা সাতশত"।

উত্তরের কোন পাহাড়ের চূড়ায় চুরমার 'এরোপ্লেন',
কুয়াশাতে দিগ্‌ভ্রান্ত পাইলট, বাঁচাতে ব্যর্থ জন-যাত্রী।
সংখ্যায় নগণ্য নয়,—উদ্ধার কার্যে দ্রুত অগ্রসর
স্বেচ্ছাসেবক, সরকারী সংস্থার দু'একটি-বাড়তি
'প্লেন', কিছু লোকজন।

সকালের 'হকার' হাঁকে গরম খবর,
উত্তর-ভিয়েৎনামে বর্বর মার্কিন আক্রমণে
গোটা একটি-শহরের মানুষ নিশ্চিহ্ন-প্রায়।
জনসনকে হত্যাপরাধী করো—রাসেল জানাচ্ছেন
জনে জনে

এ ছাড়া অতিরিক্ত খবর—বাঁকুড়া, বিহারে খরা,
সংগ্রামী মানুষের কারখানা ঘেরাও অভিযান,
পুলিশের লাঠিচালনা ছাত্রদের দাবির বিরুদ্ধে
ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা,—আমেরিকায় কালো-সাদা
নিহত পাঁচশত প্রাণ।

এরি মাঝে একটি শিশু হাসছে নিশ্চিন্ত আনন্দে,
চঞ্চল স্রোতস্বিনী বয়ে চলেছে উচ্ছল গানে
ফুলের পুষ্পিত-প্রাণ-বিনিময় ভ্রমরের সাথে,
আর আশাবাদী-প্রগতি ধায় শান্তির-অমৃত-সন্ধানে

নইলে মানুষ বুঝি ফিরে যেতো বনে

সুখের প্রকৃত বিবরণ, শান্তির তাৎপর্য,
যথার্থ ব্যাকরণ—আমার অজানা।
শুক্রগ্রহে মানুষের নিষ্ঠার যন্ত্র,
পৃথিবীতে বার্তা বয়ে আনে।
আজ নয়তো কাল, নয়তো পরশু
মানুষ নিজেই যাবে সেখানে।
'রকেটে'র ভেলকি কারিগরি
মহাকাশযানের বিশ্ব-সন্ধান,
'স্পুটনিক', 'কমেট', 'স্যাটেলাইট',—
কর্ম-সমুদ্রে প্রচণ্ড জোয়ারের বান।
পৃথিবী রত্ন-গর্ভা,—রূপসী বিচিত্র বাহারে,
যৌবন সুরক্ষিত—প্রসাধন-প্রযুক্তি-যত্নে ;
প্রচুর জাঁকজমক—অবারিত বিলাস সম্ভার,
মহার্ঘ মটরকার—রাজকীয় মসৃণ বিমান,
'এয়ারকন্‌ডিশান'- —'রেফ্রিজারেশান্‌'—'টেলিভিশান,'
—বোতাম টিপ্‌লেই হুঁজুরে হাজির,
—কী কী চাই, কী কী লাগবে
বলুন দয়া করে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান,—পরিবার পরিকল্পনা,
সার্থক হাতিয়ার।
জন্মলগ্ন থেকে মানুষের বয়সের হার
শত-বৃদ্ধি—আর,
স্বাস্থ্য-সমুন্নত রক্তিম দেহের আস্বাদ।
তবু কতো কোলাহল, হানাহানি,
যুদ্ধ, জান্তব বিভীষিকা, মহামারী,
দুর্ভিক্ষ—মারামারি—আত্মহত্যা—অশান্তি।

"আর দেখ—
আমি কোন এক গণ্ড গাঁয়ের বুকে
রচনা করেছি নিভৃত নীড়।
সেখানে সকাল, দুপুর, সন্ধ্যার আসরে
কোমলাঙ্গী পাখীরা নির্জনতায় গান করে।
সুরসিকা স্ত্রী, সুবাধ্য-সন্তানেরা—আছে ঘিরে
গোরুর দুধ, খেতের ধান, জিয়ানো মাছ,
প্রাচুর্য নয়—সচ্ছলতা—অখণ্ড অবসর,
পুঁথিপত্র—হরেক 'হবি' নিয়ে বেশ আছি;
সুখ কি এখনো অনায়ত্ত,
শান্তি কি কানামাছি'?"
এই বলেই তিনি দম নিলেন।
আমি বিস্মিত—হতবাক্।
যদিচ বিশবছর বাদে দেখা,
তথাপি কিছু-কিঞ্চিৎ সমাচার রাখি
বন্ধুবরের।
জালিয়াতির কয়েক দফায় দীর্ঘ মেয়াদী
সশ্রম কারাদণ্ডের কয়েদ ছিল,
ছাড়পত্র পেয়েছে সম্প্রতি।

অবিবাহিত, একক, নিঃসঙ্গ
তিনকুলে তার কেউ নেই,
আর অত্যাশ্চর্য যে কাহিনী শুনি,
সে তো জুয়ারীর বাজি জেতার
কপোল কল্পনা।

তবু দেখি তৎক্ষণাৎ—
দু' চোখে তার বসন্ত বাহার—জাগে,
মেঘমেদুর মুখে—গোলাপী আচ্ছন্নতা—আনে
ঠোঁটের কোণে 'ফ্লোরেন্টাইন' হাসি—ফোটে,
ভরন্ত তৃপ্তির আশ্লেষ—সর্বাঙ্গে জড়িয়ে
—অলিভ অয়েল লাবনী।
মনে আমার তীব্র প্রতিক্রিয়া,
মিশ্র ভাবান্তর।
ক্রোধ কিংবা দ্বেষ নয়
কারুণ্য অনুকম্পাব অম্ল—মিথস্ক্রিয়া।
জানি আমি এই রিক্ত, নিঃস্ব, মধ্যবিত্ত জীবনে
এ মিথ্যাচারিতা নয়।
এক অপরূপ আত্মপ্রবঞ্চনা
দিবা-স্বপ্ন,—বাঁচবার ললিত ছলনা,
সোনালী আশার অন্তিম অবলম্বন,
—নইলে "মানুষ বুঝি ফিরে যেতো বনে"।

পারিবারিক

স্ত্রী আমাকে বলেছিলেন একদিন
তাঁকে নিয়ে একটি কবিতা লিখতে।
আমি তাঁকে বোঝাতে পারি নি
স্ত্রীকে নিয়ে কাব্য লেখা চলে না,
ওতে পৌরুষের দুয়ারে ঘা পড়ে,
স্ত্রৈন বদনামের আশঙ্কা থাকে তাতে।
বলেছিলাম স্ত্রী তো নিত্য নূতন নয়,
অতিপরিচয়ের গ্লানিতে মলিন ;
রোজকার ঘষামাজায়
প্রথম দিনের সে জলুস যায় মরে
রঙ যায় চটে, মিনেকরা কারুকার্যের নীচে
বেরিয়ে পড়ে খাদের ভেজাল।
স্ত্রী শুনে চায়ের কাপটা
সজোরে রেখেছে টেবিলে।
তার প্রস্থানোন্মুখ চঞ্চল আঁচলটা
টেনে ধরতেই বলেছে—
"সত্যি তাই, কী বা আছে লিখবার আমাদের নিয়ে ;
মধ্যবিত্তের আটপৌরে বৌ আমরা
সাধারণের সীমাকে পাবি না ছাড়াতে
আমাদের আছেই বা কী"।
সজোরে আঁচলটা ছিনিয়ে নিয়ে
দুম্‌দুম্‌ পা ফেলে গেছে চলে।

দুঃখ হয়েছে বেচারীর 'পর
এই শান্ত সরল অভিমানিনীকে চাইনি আঘাত দিতে।

কিন্তু আছেই বা কী এদের !
সারাদিনের হাড় ভাঙা খাটুনী,
দিনান্তের শেষে একটুকু বিশ্রাম,
সেটুকুও জোটে না রোজ দিনের কপালে।
উদয়াস্ত একটা সংসার আগলে,
নিত্য অনটনের বেড়া ডিঙিয়ে
কোন স্বপ্নকে সফল করবে এরা,
কোন ফুলের মতো নিজেকে করবে পুষ্পিত।

আমরা পুরুষেরা বাইরে খাটি
নিজের অক্ষমতার বোঝা
স্ত্রীর মাথায় চাপিয়ে দিয়ে খালাস
কৃতকার্যের বাহাদুরিটা কিন্তু
সগৌরবে নিজেকে করে ঘোষণা।
মনের বিরক্তি প্রকাশের অনেক নালা আছে খোলা,—
আছে তাস দাবা পাশার জুটীতে,
আছে ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে
আড্ডার জাবরকাটা জীবনে।
সেখানে হয়তো কিছু বদ্‌রক্ত যায় বেরিয়ে,
ইঞ্জিনের বাঁড়তি বাষ্পের মতো
কিছু গ্লানির ধোঁয়া কালি।
অন্যদিকে স্ত্রী আছে বাঁধা-গরুর মতো,
—বাড়ীতে বসে ঝঞ্ঝাটের মার খায়।
বদ্ধ খাঁচার জীব
নিজের পরিধির মধ্যে খায় ঘুরপাক ;
যতোই তাকে খোঁচান যাক,
জানি তার বিদ্রোহের সীমা,
তর্জন গর্জনের পাহাড় ডিঙোবে না।

ভারতী বধূর মতো, এমন অদ্ভুত প্রাণী
জগতে বুঝি সত্যি দুর্লভ।

কিন্তু মাঝে মাঝে আশ্চর্য লাগে ভারী,
ভাবি সে কোন উপাদানে তৈরী,
সে কোন শক্তিতে গড়া,
এই রক্তমাংসের শরীরী জীবটা।
কোন জাদুমন্ত্রের বলে
সংসারেব রিক্ত দৈন্যের হাহাকার
গ্লানিময় তিক্ততার ফণা
বীভৎস গহ্বর থেকে পারে না বেরুতে।
যেন কাল কেউটের ছোবল্‌কে অস্বীকার করে
সাপুড়ে সাপ খেলায়—
বশীকরণে বিবশ রাখে ঝাঁপিতে।

পরের ঘরের একটি মেয়ে
কোনদিন যার পরিচয় ছিল না জানা,
যে দেখেনি শ্বশুরের ভিটে, স্বামীর ঘর
অভিজ্ঞতার ক্ষীণ অবকাশও ছিল না যেখানে,
একদিন সে এলো একটা বিয়ের মন্ত্র পড়ে।
সে শুধু এলো না, এলো সে আপন হয়ে।
যেন কত জন্মান্তরের আদান প্রদান আছে,
এই বাড়ীর ঘরে ঘরে
আঙিনার ধূলিমুঠিতে,
সাঁঝ তুলসীর বেদীমূলে।
স্বামীর পিতামাতাকে জানলো অভিন্ন বলে,
আত্মীকরণ করলো আত্মীয়-স্বজনকে
অসীম শক্তিতে।

আবাল্য লালিত সংস্কার
পরের সংস্কারের ভিটেতে এসে দাঁড়ালো,
অকম্পিত দ্বিধাহীন মনে।

এমনি করে অলক্ষ্যে
কোনদিন সে সংসারে হলো অঙ্গীভূত।
'পতি পরম দেবতা'
এতো শুধুই একটা উচ্চারণ মাত্র নয় ;
তার সমস্ত অন্তরাত্মা
একটি বিশ্বাসের মধ্যে হলো আবিষ্ট,
তার সমগ্র সত্ত্বা
একটি প্রতীকের মধ্যে হলো বিধৃত।
তাই যে হৃদয়হীন—
অশ্রুজল দিয়ে তাকে সজল করতে চায়,
যে লাম্পট্যের পায়ে বিসর্জিত
তাকে অসীম করুণায় করে ক্ষমা,
অক্ষমকে এনে বসায় বুকের রত্ন-সিংহাসনে,
প্রীতির আঁচলে চোখ মুছিয়ে দিয়ে।
কতো সহজ এদের পরিতৃপ্তি
কৃতার্থতার অকপট স্বীকৃতি।
সামান্য একটু স্নেহের সম্ভাষণে,
আলোর উত্তাপে গলা শিশিরের মতো
গলে পড়ে উজ্জ্বল হয়ে।
চপল পাতার আলোছায়া খেলার মতো
মুহূর্তে বদল হয় মুখের আদল
কখনো মানের খেলায়, কখনো হাসিতে।

সংসারের অভাব অভিযোগ
টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে
একদিন সবিস্ময়ে সে দেখে
ঝড়-ঝঞ্ঝা—বিক্ষুব্ধ
শূন্য-যানের ষ্টীয়ারিংটা তারি হাতের মুঠিতে।
আনন্দে থর থর ভয়ে বিহ্বল,
অনাস্বাদিত সে সুখ বেদনার রোমাঞ্চ নিয়ে
তারপর কতোদূর হয়েছে পার।
অক্লান্ত নীরব কর্মী
চিরনবীনার দাক্ষিণ্যের হাত
সংসারের সকল মালিন্যকে ফেলে মুছে,
শুচিতার আল্পনা এঁকে যায়
দিন প্রতিদিন ;
যেন মিছরীদানার সুতোর মতো
সংসার-আনন্দ-রসকে রাখে বেঁধে।

এরা শীতার্ত নিরানন্দ সংসারে
আনন্দময়ী-উষ্ণ-নির্ঝরিণী
কঠোর কঠিন রৌদ্রদগ্ধ মরুতে
যেন শ্যামল উদ্যানের শান্তি-সরোবর,
সংসারের ক্লেদপঙ্কে ফুটে থাকা শ্বেত পদ্ম।
স্বামীর প্রাত্যহিক কাজে
'পিঞ্জি' ফুলের মতো এদেরও পরিচিতি।
'পিঞ্জি' কিন্তু দেয় না কিছুই সূর্যকে,
এরা আপন কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে
নিঃশেষে সব দিয়ে রিক্ত হয়
অন্য সকলের কুশল কামনায়
নিজেরা হয় আত্মবিস্মৃত।

বিজ্ঞানের বইয়ে পড়া কাঁকড়া-মা'র মতো,
নিজ দেহপিণ্ডকে রেখে যায়
স্বামী-সন্তানের পুষ্টিতে
সংসারের তুষ্টি সাধতে।

বিড়ালী

ঘুম ঘুম রাতে সরীসৃপের মতো বুকে হেঁটে বাড়ীতে প্রত্যাগমন।
ঝিম্‌ঝিম্ নীরবতা, বিড়ালীর নিঃশব্দ পদসঞ্চার ;
মুখে তার পেঁচার প্রতীক্ষারত অস্বাভাবিক গাঢ় গম্ভীরতা।
স্তব্ধ মুহূর্তে দু'টি প্রাণী পাথরের মতো স্থির মুখোমুখি,
মার্জারীর চোখে জ্বলে যেন চুনীর আরক্ত জিজ্ঞাসা।
অনুযোগ, অভিযোগ, চাপা বিদ্বেষে রুষ্ট অভিমান—
সব মিশে হিংস্র বাঘিনীব মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে
ফালাফালা করে দিতে পারে শরীরের সরল সংস্থান।

ইঁদুরের মতো তড়িতাহত স্থির কম্পমান বাহ্য ইন্দ্রিয়ে,
শুধু শ্রবণযোগ্য আধ•ডজন বাচ্চার ঘুমন্ত-জলসার বংশীধ্বনি।

এই নির্জন দ্বীপের অসহায় একাকিত্বে—
কী করে বশে আনি, ঐ একরোখা মনের সাপিনীকে।
কী করে বুঝাই এই অবুঝ জীবটিকে—অস্তিত্বের তাগিদে
রোজ কতো রক্ত ঝরাই অশ্রু-সেঁকা রুটির বিনিময়ে!
দিনরাত হন্যে হয়ে ঘোরা হাজারো ফিকিরে,
সত্য মিথ্যে পাঁচ মেশালী গোঁজামিলের জ্বালা।
এই পরজীবী প্রাণীর কাছে প্রচেষ্টা নয়—সফলতাই সত্য।

আমায় ক্লান্ত দেহে তীক্ষ্ণ-অন্বীষা, গন্ধ শুঁকে শুঁকে কিছু
সংগ্রহের আশা।
আদরের পোশা প্রাণী কষ্ট দিতে কষ্ট হয়,
হিংস্র হতে ভয় পাই, পাছে সখ্যতার সুতো ছেঁড়ে।
অতএব উপস্থিত বুদ্ধি,—বন্ধুদত্ত মাংসের ঝোলাটি
নাকের ডগায় ঘনঘন নাচাই—বলাই ভালো ভবিষ্যতের বরাদ্দে।
দেখি তোষামোদের ফল পেকেছে,—মুখটি মোলায়েম,
ধারালো চোয়াল ঈষৎ অবনত—রসালো লোভাতুর।
স্তিমিত চোখে কটা হাসির ঝিলিক জাগে,
খুচি খুচি দাঁতের ধারের সাদা রোশনাই।

তারপর মাঝরাতের শেষে—
যখন ঘণ্টাঘড়ি হাঁক দিয়ে যায় চলে,
তখন বিড়ালী উঠে আসে—মাংস চিবোয় হাড় চোষে,
রক্ত শুষে খায়,
—তবে সে,—তবে সে,—আমারি শরীরের।

এ সংসারে

এ সংসারে কা'কে তুমি রাখবে ধরে,
সবাই স্বাধীন, সবাই স্ব, স্ব, সুখী কিংবা দুঃখী।
যে তোমার প্রিয়বন্ধু প্রতিদিনই মহোৎসব আনে,
হতাশার কয়লাখাদে ঝকমকে হীরের মতো হাসে,
কালকে সে বিদেশ যাবে সুদূর কালের খেয়ায়,
কিংবা কোন ভিন্ গাঁয়ে সে ঘর বাঁধবে স্থায়ী,
অস্থায়ী এ বুকের মৌচাকে, রিক্তমধু, —তিক্তহুল
থাকবে শুধু পড়ে,
এ সংসারে কা'কে তুমি রাখবে ধরে!

আজকে যা'কে প্রীতি দিয়ে আঁকড়ে ধর
প্রাণের শিকড়ে, আগামী দিনের অন্ধকার বিভীষণ রাতে
তোমার পিঠে ছুরি হানে কুটিল কালো হাতে—
ঈর্ষাঘাতক রক্ত-ফলায় ছট্‌ফটিয়ে মর,—
পিছল মাটির পরে;
এ সংসারে কা'কে তুমি রাখবে ধরে!

মিষ্টি বৃষ্টি, আলোর কণা, সবই আসে সবই যায়
জোয়ার জলে এগিয়ে আসে, ভাঁটির টানে দিক্ হারায়।
এ সংসারে সবাই আমরা ঋতুর-পাখি।
চতুর আঁখি নাচাই কিংবা বুঁজি,
যখন যেদিক সুবিধে-বায়।

যে মেয়েকে আজকে রাতে ভালবাসার জামা পরালে,
শাড়ির আঁচল প্রীতির ছোপে হলুদ হলো,
প্রতিশ্রুতির পাকা ভিতে—'মোজেক' এঁকে,

জাম-কাজল সজল চোখে চুমু চড়ালে,
কালকে তুমি শেষ সময়ে দেখলে এসে বিদেশ ফিরে,
লালচেলীর জীবন-বীমা স্বপ্ন দেখে গরদ ঘিরে।
আগুনে-ঘিয়ে-মধু-ভিয়েনে গা মৌ মৌ গন্ধ মেখে,
দেখন-হাসি চোখ কচ্‌লে আছে বসে আসন-পিঁড়ে—
আদুরে-মেয়ের ঠোঁটের ফাঁকে আতুকে-সোহাগ ঝরে!
এ সংসারে কা'কে তুমি রাখবে ধরে,
কা—কে তুমি রাখবে ধরে!

সময়

সময়-সূচক যন্ত্রটা, আমার হাতে বাঁধা,
যৌবন কব্জিতে ওকে কাবু করেছি,
চিকণ-কালো কালের পিঠে ঘোড়-সোয়ারী হয়ে
রোমশ মুঠিতে আমি লাগাম ধরেছি।
সময় নামক স্বৈরিণী স্বেচ্ছা-নারীটি
আমার দু'টি দৃঢ় জানু, কঠিন কব্জিতে,
প্রগল্‌ভতা ভুলে ছিল নিশ্চল ভঙ্গিতে।

অকস্মাৎ একদিন সবিস্ময়ে দেখি,
পাণ্ডুর মাঠের প্রান্তে স্থান-ভ্রষ্ট আমি।
তুরীয় ঘোড়ার খুর ধায় উল্লাসে,
সুঠাম তন্বীদেহে দামিনী বিলাস,
মেঘের ঘাটে ঘাটে চকমকি জ্বালে।

পোষমানা প্রিয় ঘড়ি ঢল-ঢল করে—
লোলাঙ্গী হাতে,
(যেন) বৃদ্ধের অসহায় শক্তির অসামর্থ্যে
অতুল-রতি রমণীর কৌতুকী শ্লেষ।

আপেক্ষিক

দিনের আলোয় যে স্থানটা অতি পরিচিত,
রাত্রে তাকে অন্ধকারে দূরের মনে হয়।
যে লোকটা কাছে ছিল সারা জীবন ধরে,
সে যখন সরে গেল হঠাৎ দূর দেশে,
তখন তাকে জানাটায় কুহেলীতে ঢাকে।

যে বাতির আলোর তলায় থমকে এসে দাঁড়াই,
সেই বাতিকে মিলিয়ে নিয়ে পরিবেশের সাথে,
ভালো করেই দেখি, চিনি, জানি।
আবার যখন ছেড়ে যাই সামনে চলার পথে,
মনে হয় পেছুটাকে, রহস্যেতে ঘেরা।
আকাশেতে উড়ি যখন দ্রুত-যন্ত্রযানে,
পৃথিবীটা মনে হয় অপরিচিতের মতো।
রাত্রে যখন নিভৃতে বসে কাব্য লিখি ঘরে
চারিদিকের স্তব্ধতায় সারা জগৎ ঘুমায়,
তখন বুঝি কতো একা,--আগন্তুকের মতো,
এই পৃথিবী আমার কাছে স্বল্প-পরিচিত।

জীবন থেকে দূরে যাওয়ার নামই যদি মৃত্যু
তাহলে তো ঘটছে সেটি রোজই অহরহ।
সত্য এবং মিথ্যাতে লড়াই যদি বাধে,
কে যে সত্য, কে যে মিথ্যা, যাচাই করা ভার,
মৃত্যু মানেই জীবন, বা জীবন মানেই মৃত্যু,
শেষ প্রশ্নের জবাব দিতে মৃত্যুকে আজ ডাকি।

প্রশ্ন

পিঙ্গল পাহাড়ের প্রান্তে, শূন্য প্রান্তরে,
ঝড়ের উদ্দামকণ্ঠে ডাকি উচ্চৈঃস্বরে
"হে ঈশ্বর তুমি আছ" ?
পরীর মতো দ্রুত এসে প্রতিধ্বনি বলে হেসে
—'তুমি আছ' !
আবার শব্দের শর সম্মুখে ধাবমান,
সান্ধ্য বাতাস খান্ খান্—
"তুমি কি এখানে নাই" ?
সে দিল উত্তর তেমনি—'নাই—নাই' !
"আমিই কী এখানে আছি"—
প্রশ্নের পায়রা উড়িয়ে দিলাম
আকাশের কাছাকাছি।
প্রতিধ্বনির সুনিশ্চিত জবাব ছুটে আসে—
'আছি—আছি' !
প্রগাঢ় প্রত্যয়ে প্রশ্নকরি তাই,
—"আমি কি এখানে নাই" ?
ভগ্ন কণ্ঠস্বর ফিরে ফিরে হাহাকার করে,
'নাই—নাই—নাই'।
কিন্তু আমার শরীরের রোমাঞ্চ-রাগ
অস্তিত্বের বাস্তবতা,
আমার কাছে স্পষ্ট-বাক্
আমার আমিত্ব কখনো মিথ্যে বলে না।
কিন্তু ঈশ্বরত্ব মীমাংসা সাপেক্ষ
সূর্যের মতো জ[illegible] না।



তবু মানি এতে কোন কিছু প্রমাণিত নয়,-
কোন সত্য সিদ্ধান্তে অজর অক্ষয়,
যেহেতু পদ্ধতিতে মিথ্যা সর্বস্বতা,
প্রণালী বলাই বাহুল্য স্রেফ্ বাতুলতা।

শুধু বলা চলে বিষয়টি অপূর্ব অপরূপ,
আমি নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস টানি,
হাতড়াই বিবেকের হাত তুইখানি।

প্রীতিলতা

সংসার শূন্যহাত হতো
যদি প্রীতিলতা রইতো বিরত,
বাঁধতে তার রাখীর বন্ধন।

সময়ের ঘনিত অন্ধকারে,
পাশব-বেদনার বাষ্প-বিকারে
আমাদের বিদীর্ণ ক্রন্দন,
স্তম্ভিত দেয়ালে প্রতিহত—
বুকে নিয়ে নিষ্ঠুর ক্ষত,
অবক্ষয়ী মৃত্যুর শাসনে।

প্রীতি আজে তাই আছি,
আমরা ঘেষাঘেষি কাছাকাছি,
বাঁচবার যফল প্রয়াসে।

নাহলে স্বর্ণিল আশার আকাশ,
মাটির মতো শ্যামল বিশ্বাস,
দগ্ধ হতো দীপ্র-দীর্ঘশ্বাসে

দাও ফিরে আমার শৈশব

ভোরের নীলাভ আলো আমাকে শুধালো,
—"কী তুমি ইচ্ছা করো",
আমি মগ্ন-নিরুত্তর।
সোনালী পাখী ডেকে বলে
-- 'কী তোমার বাসনা',
আমি স্তব্ধ—বধির প্রাণ।
গাছেদের হাতছানিতে নিগূঢ়-জিজ্ঞাসা,
—'কী তোমার অভিলাষ,'
আমি বিকল -বাক্হীন।
কচি কচি তৃণদল দু'হাত বাড়িয়ে ধরে,
—'কী তোমার প্রশ্ন পথিক'!
—"দাও ফিরে আমার শৈশব",
শিশিরভেজা সবুজ ঘাসে চঞ্চল পা দুটি ছুট দিল।

ভালোবাসি

জাতি-যুথী বন-মালতী বকুল ঝরা মাঠ, .
শাপলা-লতা, শেওলা-সোঁতা, শেওড়া-তলার ঘাট।
তাল-শাঁস, খেজুর-রস, টাটকা কাঁঠাল কোয়া,
ভালোবাসি শিশুর হাসি, মায়ের স্নেহের ছোঁয়া।
সকাল বেলা, রোদের মেলা গাছের ডালে ডালে,
সূর্যি-সখার আবীর মাখা সাঁঝের নদীর ভালে।
গাছের তলা জোনাক্ জ্বলা গভীর কালো রাতে,
জোছ্না-গাঁজন ছায়ার নাচন পোড়ো-বাড়ীর ছাতে
মন চলে যায় রথের মেলা ছোট্ট খোলার হাট,
যাত্রাগানের রাজার তরে বুক করে ফাট্ ফাট্।

শিশুর বাসনা

মা, মা, ডাকিস কেন তুই,
আমি এখন পারব না যেতে,
লেবু গাছে ধরছি মাগুর মাছ
খাব আমি মস্ত পিঁড়ি পেতে।

বিকাল বেলায় যাবি আমার সাথে
ঐ ও দিকে মেডি-স্কুলেব মাঠে
ওখানে অনেক বক আছে মা জানিস্
দৌড়ে আমি ধরবো ও:দের—হাতে।

বক্‌কে এনে রাখবো 'চালের' উপর
দড়ি দিয়ে বাঁধ্‌বো শক্ত করে,
খেতে দেব চাল, ছোলা আর চিনি,
মাগুর মাছ—আর কিচ্ছু তো নাই ঘরে

ইস্কুলের মাঠে আছে অনেক ফুল,
জিনিয়া, বেলি, পিন্‌ক, জেস্‌মিন,
তোঁকে আমি এনে দেব মা সব,
রান্না ঘরে সাজাবি রোজ দিন।

মাঠ থেকে আনবো ধরে পাখি,
শালিখ, চিল, শকুন, ময়না,
খাঁচাতে তুই রাখবি ওদের ধরে,
খেতে দিবি রুটি, বিস্কুট, ছানা।

শিশুর ঘুম

ভোম্‌রা কালো চোখের ভোমা,
উঠ্‌ছে আর নামছে,
প্রজাপতির পাখ্‌না যেন,
থির্‌ থিরিয়ে কাঁপছে।

চোখের মণি ঘুর্‌ছে দুটি—
নিটোল কালো মোতি
অধরে তার হাসির রেখা
পৌর্ণ-মাসীর জ্যোতি!

নিঃশ্বাসে তার বাতাস ভরে
চন্দনেরই গন্ধে,
গোলাপ রাঙা রঙের আভা
দুইটি মুঠির বন্ধে।

গড়িয়ে পড়ে স্বেদবিন্দু,
কুরুবিন্দের দানা,
কুন্দ-কলির কান্ত-কায়ায়
শুভ্র শিশির-পানা।

পলাশলাল পাতলা ঠোঁটে
অমিয় মধু ঝরছে
পিপীল পোকা পদ্ম ভেবে
পরাগ লোভে ঘুরছে।

অনির্বচনীয়

শিশুর তনু যেন পুষ্পিত লতা,
আর হাসি তার মন্দাকিনীর
অশ্রুত বারতা।

শিশুর মুখমণ্ডল শিশিরের জল,
প্রতিবিম্বনে উষার সূর্য-কিরণ,
রচে বিমুগ্ধ-স্মৃতির সুরমণ্ডল,
ঝংকারে প্রথম প্রেম,—স্বয়ং প্রকাশ,
—চেতনার জন্ম-ইতিহাস।

শিশুর চোখের জ্যোতি, ফলের টস্‌টসে
রসস্থ রূপ,
স্বচ্ছ খোসা ভেদ করে, দেখে তার অবয়ব
পূর্ণ স্বরূপ।

শিশুর মন এক সুনির্মল কাঁচ
সারা বিশ্ব হাসে ধরা পড়ে,
ধ্রুব এবং অনির্বচনীয়—
অরূপ রতন—যদিও চূর্ণিত,
ধূলিকীর্ণ পৃথিবীর রুক্ষ প্রান্তরে।

এক দৃশ্য-পটে

(১)

সূর্যের চূর্ণিত কাঁচে
সকালের কমলা-আলো,
শিশুর আপেল-গালে
তুষার সম্পাত ।

ঘাসের সবুজ বুকে
শ্যামল গালিচা
সুন্দরীর হাসি ধরা
বকের পালকে—

শিশুটি নারীর হাতে
রঙিণ নির্ঝরিণী শৈল-সাথে লীন --
ছল্‌কায় ঢেউ ভাঙে সহাস্য কৌতুকে—।
চলে পিছে নারঙ্গি রোদ,
সূর্য, ঘাস, বকের পালক—
এবং সমগ্র বিশ্ব—এক দৃশ্য-পটে ।

(২)

দুটি রক্তিম ডালিমের ফল
তরুর তনুতে দোলে,
নগ্ন-নির্জন রমণীয় সমারূহে ।
তৃষিত ঘাসের দৃষ্টিতে ভাসে,
অবোধ রসের বিলাস,
মুখের ওপরে ঘনভার এক—
উষ্ণ ফল্গু বহে ।

প্রাকৃতিক

বাসন্তী শাড়ি পরে হৈমন্তী বসে,
সূর্য এসে দিয়ে যায় ঠোঁটে তার চুমা
আপক্ক ধানের শীষে শিহরণ জাগে
অবসাদে নুয়ে পড়ে বাতাসের কোলে—
শৈশবের সহচরী পাশে।
সারা রাত জমা জল চোখের কিনারে
ঝরেছে শিশির হয়ে হেমন্তের মাঠে।
'কুররের' কণ্ঠ ছড়ায় শান্ত-আকাশে
সে সুখ-সংবাদ।

নদীর তীরের থেকে 'স্নাইপের' স্বর
জলতরঙ্গ বাজায় জলের যন্ত্রেতে,
নারঙ্গ রোদ মেখে প্রজাপতি হাসে
শর্ষে ফুলের 'পরে প্রীতির আলোতে,
ভোম্‌রারা খেলা করে ধানের খোঁপায়।

হঠাৎ পায়ের শব্দে 'ভারুয়ের' দল,
ভুরুৎ ভয়ার্ত পাখায় ভরে প্রান্তর,
ঘর-ভাঙা মৌমাছি, মৌচাক ছাড়ে যেন
বালকের খেয়ালী ঢিলে।

দুপুরের পড়ন্ত রোদে 'তিতিরের' ডাক,
বনতুলসীর বনে শরেদেব ভিড়ে
কুহকিনী নারীর মতো লুব্ধ ইঙ্গিতে—
চলে ফিরে ফিরে;

'শঙ্খচিল' ডেকে যায় নির্জন নদীতে
বনের ওপারে।

কৃষককন্যার শাড়ি আহ্লাদ আস্বাদে
ঘ্রাণ মাখে সিক্ত-যূথী দেহের সীমায়।
চঞ্চল আঙুল কাড়ে মাটির সোহাগ
বুকের সব্জী হাসে চোখের ছায়ায়
মাথায় খড়ের আঁটি দেহের হিল্লোলে।
'গাংচিল' পাখ্সাটে রূপসী কামনা,
তীক্ষ্ণ শীৎকারে ঘাসে রোমাঞ্চের স্বাদ।

তারপর একদিন ফুরায় এ খেলা,
কৃষকের-ঈশ্বর-হাতে।
অনেক কথার সুর গানের গুঞ্জন
অনেক হাসি কান্না, স্মৃতি-বিস্মৃতি,
ফল, জল, ফুলদল, গাছেদের সাথে,
হারায় একে একে বিদায়ী বৎসরে।

কাঁচামিঠে সকালের রোদটুকু কেড়ে
বিকালকে পাড়ি দিয়ে সন্ধ্যাশীত নামে।
বিষণ্ণ ছায়ায় বসে ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
স্থবিরের অর্থহীন প্রলাপের মতো।
মাঝে মাঝে ছেদ পড়ে পাখার ঝাপটে,
'রাত-চরা' বাঁশঝাড়ে নামে ঝুপ্ঝাপ।

শূন্য ক্ষেত ধু-ধু করা প্রান্তরের পরে,
বাজ আর বাদুড়ের গুপ্ত আনাগোনা,
শিকারীর চোখে দেখে আকাশের নীচে
পোকা আর ইঁদুরের ত্রাস্ত পলায়ন।

কুয়াশার মশারী ফেলে নিদ্রালু রাত
অলস শয্যাপাতে হিমনীল মাঠে।
মড়ার মুখের মতো পাণ্ডুর মুখে
নিঃসঙ্গ বুড়ো চাঁদ নির্জনের আকাশে,
একা একা বসে বসে হাসে আর কাঁদে

আকাশ কী গভীর নীল

আকাশ কী গভীর নীল, সামুদ্রিক নীলিমার স্তব্ধ সমাহিত
বিস্ময়ের মতো,
যেন অনন্ত রহস্যময়ী কোন নারীর কিশোরী হাস্যে ঈষৎ অবনত,
চাপা ওষ্ঠের স্ফুরিত ব্যঞ্জনায় মধুপের চঞ্চলতা মাখা।
উজ্জ্বল চোখের জেটিতে বন্দরিত জাহাজ হতে ভাসা,
তরঙ্গ-ভঙ্গে নাচে আলোকের পাখা।
'কৃষ্ণসার' রেশম রোমের মতো কাল্‌চে চুল সন্ধ্যার অন্ধকার
ছায়াঘন হয়ে নেমে আসে,
পূর্ণিমার চাঁদ যেন চন্দনের টিপ, কপালের কটিতটে হাসে।
শিমুল মেঘের ফাঁকে শিশু জ্যোছনার খুশি হিরণ্য হাসি হয়ে ঝরে
'লালসর' হাঁসেদের প্রগলভ পাখার সঞ্চার
শেফালির মৌন মিছিলের মালা গড়ে।
বনের উপান্ত সীমা বন-মউলের ডালে আঁচলের পাড় বুনে চলে,
ঝিল্‌মিল ঝোরার বুকে কাঁকর-কিঙ্কিনী, করুণ বিরহ ব্যথা ভোলে।
আসন-সমুদ্রে বাঁধা নিতম্ব-পৃথিবী ; পিনদ্ধ পাহাড়ী বুকে স্বচ্ছ চূড়া দু'টি
কুহেলী কাঁচুলি খুলে ফেলে,
রক্তিম কামনা যেন স্তনাগ্র চূড়ায়, সারারাত কাঁপে দীপ জ্বেলে।

লবণাক্ত বাসনার সিক্তবেশে দেখি আমি
সুদূর সমুদ্র পার হতে পর্বতের শেষ,

অলস আকাশ দেখে তন্মুর তৃষ্ণাতে, পিঙ্গল বনের আঁচলে
নিঃসঙ্গ মনের প্রতিবেশ।
বাসকসজ্জা রচে রতিপরা প্রকৃতি, প্রতিভার প্রতীক্ষায় জাগে
রাত্রির শয্যাতে,
তারা চোখে ঢুলু ঢুলু আবেশে অবশিত, ভাবনি ভঙ্গিমাতে
জড়িত লজ্জাতে।
প্রমত্ত কামনা আমার দীর্ঘশ্বাস হাহাকারে হয়েছে ধাবিত আজ,
ঘূর্ণি হাওয়ার পিছে পিছে,
মানি আমি, অপ্রমেয় প্রেম, সে যে আলেয়ার আলো,
বৃথা অন্বেষণ তার আক্ষেপ মিছে।

আমি তাই রেখে যাই জীবনের অভিলাষ রূপময়ী প্রকৃতির কাছে,
আমাকে আলিঙ্গনে বেঁধো শুধু একবার আবীর আবেগে,
ও বুকের মাঝে,
অতৃপ্ত মৃত্যুদিনে, শেষ অশ্রু সাঁঝে।

সন্ধ্যা

আমার হাত ধরলো সে—সেই অধরা
বললো চুপি চুপি ফিসফিসিয়ে,
—চলে এসো, চলে গেছে সে ছায়া তার,
এখন তুমি সবার অধিক প্রিয় আমার
একলা নিরালায়—বললো সে ফিস্‌ফিসিয়ে
এখন তুমি সবার চেয়ে প্রিয়তম আমারি—
ঝরলো পাতা ঝুমুর বোলে, পাহাড়তলি বনের তলে,
সাঁওতালী নীল গাঁয়ের অন্তরালে,
—হাত নাড়ালো অলৌকিক,

চোখের দিশা মৃগতৃষা—তিলোত্তমা
মুখের আদল ফুল্ল-পলাশ-রক্তরাগ,
প্রতিবিম্ব থরো থরো নদীর জলে—ঘরের চালে
পাতাগুলি কাঁপলো এলোমেলো —কামনা গড়া
কুমারী হৃদয় ভাঙলো শতেক ঢেউ,—
সেই কিশোরীর চপলতা টানলো আমায়
নদীর পারে—ঘাসের আড়ে—আসন পাতা যেখানে
বসি আমি, আমার পাশে উষ্ণ দেহের রোমাঞ্চ
আনে নারী—কপাল জুড়ে বজ্রমণি
জ্বলজ্বলে টিপ—চোখে কাজল খয়রা কালো
অলক্তরাগ ঠোঁটেতে—পা ডুবিয়ে জলের টানে
ঝিলিমিলি স্বপ্ন আনে—নীলাঞ্জন আঁচল ছায়
পাখার মতো শীতলতায় বাসন্তিকা বাতাস বোনে
আপন মনে—গভীর কী এক গন্ধ আনে
অঙ্গ ঘিরে আবেশে তনু অবশ হয়,
রসিকা বুঝি মনের কথা সবই জানে
মনের কথা বলে না শুধু সরবে চোখ ইশারা
সলাজ হাসি জানায় শুধু আভাসে—মৌন দিয়ে
মৌনতাকে ঢেকে রেখে শুনবে স্বর—আমার গানের
আমার কথার গুঞ্জরন—ভোমরা পাখায়
যখন তার সঞ্চরন—মিতালি পাতে,
সাগর ফেরা বাতাসে—ছড়িয়ে দিলাম
যোজন পথ আমার সুর অনেক দূর—ঘুরে ঘুরে
আকাশ পথে পাহাড় হতে পাইন বন—ঘিরে ঘিরে
সোনালী আভা নদীর নীরে—মাঠের বাটে
ধীরে ধীরে ফিরে ফিরে—শীতের রাতের কুয়াশা যেন
বুকের ওপর মুখের ওপর তার, বুলিয়ে দিল
আঙুলগুলি স্পর্শ খোঁজা হাত দু’খানি

তুলে দিল আমার হাতে—আর
হাতে হাত বাহুতে বাহু ডুবিয়ে দিলাম মুখ
—ভরাট বুক ঘন চুলের রাশি রাশি
মেঘের মতো আড়ম্বরে ছড়িয়ে দিয়ে
আছে বসে, হাসির সাথে কলমহীরে—
বিজুলি চলে থেকে থেকে—তেমনি তর
ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখা কোমলাঙ্গীর
কুসুম স্তন, রেশমি চুল গন্ধমাখা
বেল-মালতীর—পাখির মতো কোমল পালক
ডানা মেলে ঢেকে দিল সারা শরীর
চেতনা সুখে মগ্নমন—বিলাস রতি
ধরে রাখা ধুপ শাড়িতে তনুর বাঁধন
দুলিয়ে দিল অনন্ত—অনন্তকাল দুলছি যেন
দুইটি হৃদয় দুল্‌ছি যেন, অনন্ত, অধর দিয়ে
অধর ঢেকে, —সহসা চাঁদ মস্ত বড়
বনের মাথায় সকৌতুকে উঠলো হেসে
হেলেদুলে আড়াল থেকে—অমনি প্রিয়া
শিথিল বাঁধন সুযোগে ছায়ার মতো
মিলিয়ে গেল—মায়াবিনী মেখলা ফেলে
আসব বলে—'আবার কাল'—ইঙ্গিতে,
তেপান্তরে—চন্দ্রাবলী—একলা বসে,
শুন্‌ছি বসে, শুন্‌ছি শুধুই—'আবার কাল'—
শুন্‌ছি বসে—'আবার কাল'—অনন্ত
গভীর রাত—
ঝিঁ ঝিঁ ডাকা নির্জনতার প্রাঙ্গণে।

স্মৃতি ও স্বপ্ন

একটি স্মৃতির ভ্রমর গুন্ গুন্ করে মাথার ভিতরে
স্বপ্নের মধু জমে মখ্‌মল—মাখনের মতো।
অকস্মাৎ অসতর্ক সূর্যের আলোকের স্পর্শ-প্রহরে
গলে গলে গান হয়ে স্বপ্নটি স্মৃতিতে বিগত।

শীতের কুয়াশার মতো সে স্মৃতির সর্পিল শরীরে
রূপহীন, নিরাকার, স্পর্শহীন অস্তিত্বের সুর।
শরতের শাল্মলী-শাড়ি যেন নদীর গভীরে
দোলায় ছায়ার-তনু তবুও সে দূর বহুদূর।

তেমনি আমার স্বপ্ন, স্মৃতিটিকে আলিঙ্গন করে।
ছুয়েতে ঘেষাঘেষি কখনো কচিৎ ;
তবুও সময়ের বৃন্তে অবসর পলাশেরা ঝরে
আমার স্বপ্ন মাখে মিষ্টি কোন স্মৃতি বুকে—
'বৌ' 'বৌ' ঘ্রাণের সঙ্গীত।

অন্তরালে

চাঁদের শরীর ঢেকে যায়
মেঘলা অতনুর তলে।
পাশে ক্ষুব্ধ জ্যোছনা কাঁদে,
ঈর্ষায় জ্বলে—আকাশ-পাষাণে
বারে বারে ব্যর্থ আঁচড়ায়।

ক্ষণ পরে মুক্ত চাঁদ
লজ্জাহত হাসে, জ্যোছনাকে
আদরে জড়ায় ; মেখলার পাশে ম্রিয়মাণ
জ্যোছনা ভাবে—'যে ছিল তার
একান্ত আপনার, এ কি সেই,
অবিভাজ্য আনন্দ আধার—অথবা
অন্য এক প্রতারণা'—যার মায়া
না বুঝে ছায়া ছায়া মনে
কান্নার রাত বোনে, পুঞ্জ পুঞ্জ
বেদনা ঝরায় বিছানার বনে।

শেষে ভালোবাসলাম

'মিতা'—
তোমার চোখে চোখ রাখলাম
তোমায় ঠোঁঠে ঠোঁট রাখলাম
বুকে তোমার বুক পাতলাম
রক্তে রক্তে শোধ।

সাগরের জলে ঢেউ নীল নীল
নীলের ছায়ায় আকাশের চিল
চিলের ডানায় রোদ ঝিল্‌মিল্‌
নূতন জীবন বোধ।

তোমার মনে মন রেখে রেখে
তোমার হাসিতে হাসি দেখে দেখে
তোমার দুঃখে দুখ মেখে মেখে
হৃদয়কে জাগালাম।

তোমার হাত আমার বশে
আমার হাতে আঁচল খসে
বুকের ওপরে বুক ঘষে ঘষে
শেষে ভালোবাসলাম।

হরিণেরা

এখানে এই নির্জন বনের প্রান্তরে
সকালে, সন্ধ্যায়, মাঝরাতে হরিণেরা
নির্ভীক বিচরণ করে তৃণাঙ্কুর 'পরে।
নাতিদূরে সোঁতার সচল হাতছানি
অতল কালো গভীর চোখে তার দৃষ্টিপাত।
কখনো আনমনা হরিণের শরীরের ঘ্রাণে
চুম্বনের মতো ঝরে বর্ষার জল ধারাপাত।
মৌসুমী ফুলের বিলাস বন্য প্রগল্‌ভতা
পাইনের পাতায় পাতায় কী জাদু জানে।
শিশুর ভালোবাসার মতো কাঁচা সোনা সকালের রোদে
শাখামৃগ অনুরাগে ছুঁড়ে দেয় কচি কিশলয়,
প্রীতির প্রত্যাশা মাখা হরিণের মুখে—মদির আমোদে।
এই শান্ত নিরালায় সোহাগের মধু ঝরে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে,
স্নেহের শিশিরে মুক্তোর মন গড়ে আনন্দ আশ্বাসে।

ফাল্গুনী চাঁদ ঢলে গেলে হরিণেরা
সহসা চকিত দেখে কালো এক ছায়া
গুঁড়ি মেরে আসে ঘন শয়তানের মতো।
মুহূর্তে দ্রুত পদ সঞ্চারে,—ঘাসের আস্বাদ,

সব স্বপ্ন, প্রেম প্রীতি ভালোবাসা ভুলে
মৃত্যুর অমোঘ হাত দিতে চায় ফাঁকি।
তবু তা পারে কি ? কোন এক আততায়ী 'পোচারের' হাতে,
ঘৃণিত 'বুলেট' ভেদ করে চলে যায় ছোট্ট এক
পুষ্পিত প্রাণ ; রাতের বিভাস কাঁদে ঘাসের উপরে।
তারপর বাহকের বাঁশের মাচানে
নিঃসর্ত দান বলে বিবেচিত চলে যায়
ঘাতকের ঘরে।

হয়তো তখনো প্রত্যাগত সাথীদের মনে
ক্ষীণ এক প্রত্যাশার দীপ কেঁপে কেঁপে ওঠে,
—'যদি ফিরে আসে সেই শস্পময় সবুজ প্রাঙ্গণে।
তারপর ধীরে ধীরে মুছে যায় মনের গোপনে
সে আশার আলো।
শুধু অশ্রু জেগে থাকে বার বার জানাতে ধিক্কার
—'এই যে তাজা রক্ত কাঁপে শিশুর সরলতা নিয়ে
কোন অপরাধে তোমার জল্লাদ-হাত হেনেছে আঘাত
পৃথিবীর সব মায়া, ভালোবাসা, স্নেহ
অনুপম সুষমার-অপার প্রতীক,—
ছোট্ট এই নিষ্পাপ জীবিতের দেহে'।

চাঁদ ডুবে যায়,
শুধু শেষ নক্ষত্রের গায়, বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝল্‌সায়।
শালের ঘণিত দীর্ঘশ্বাস সংগোপনে ধরে রাখে,
সে অমানুষিক মৃত্যু ইতিহাস।

যতক্ষণ আমার লক্ষ্যের আলো

যতক্ষণ আমার লক্ষ্যের আলো অবিচল ধ্রুব-বীক্ষণ
হোক সে আলোক স্তম্ভে কিংবা পথের প্রাকারে,
আমার শরীরীছায়া শৃঙ্খলিত কুকুরের মতো
প্রভুর অনুসরণে তীক্ষ্ণ-অনুক্ষণ।

কিন্তু যেই মাত্র সে বর্তিকা অতিবর্তন করি
পা রাখি অনিশ্চিত অন্ধকার পথে,
সেই মাত্র সে অতিশায়ী সঞ্চারিত ছায়া,
সমারূঢ় সিংহাসনে দিগ্‌দর্শন—রথে।
সে আমাকে বিনা ক্লেশে নিয়ে যেতে পারে
অতলান্ত পাতালের পাঁকে, কিংবা নরকের দ্বারে।

বাস্তবিক

আমার আশ্চর্য চোখ লজ্জাহত মরে
—আজকের জ্ঞানী-গুণী অর্থের মিটারে
বিশ্বকে পরিমাপ করে।

আমার বিস্ময় বোধ হতবাক দেখে
—আজকের পরিণেয় প্রজ্ঞাপারমিতা
পুরুষের অর্থকরী ঐশ্বর্য—বণিতা।

কিন্তু আমার বিস্ময় নিরাশায় জ্বলে,
যখন লক্ষ্য করি সুসভ্য-বন্দরে
পশুদের হাতে, মানুষের পাইকারী
বেচাকেনা চলে।

এক ঝলক

স্ত্রীটি রোগশয্যায়,
কাতর আর্তি—স্বামীতে শুদ্ধা-ভক্তি
লোকটি নির্বিকার—'ক্রাইম-স্টোরি',
পরনারী সংশক্তি!

ছেলেটি আঘাটে—ঝানু ও বখাটে
ভদ্রলোক ডক্‌টরেট,—প্রবন্ধ মূল্যবান বইটির
বিদগ্ধ গবেষণালয়,
—'মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষা পরিচয়'।

বিদেশে দুর্ভিক্ষ,—তহবিল অভিযান,
চ্যারিটি-নৃত্যাভিনয়,
প্রতিবেশী আতুর, হত-দরিদ্র,
যুবতীর দেহ বাঁচে,—দেহ-বিনিময়।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিপদাপন্ন সৈনিক,
বিপক্ষ,—মানবিক পরিচর্যা রত,
এ পাশে লড়াই, আদর্শের সংঘাত,
পরস্পর মৃত্যুহিম ক্ষতবিক্ষত।

বিজ্ঞানের অসামান্য
ফলপ্রসূ সাফল্য—
মঙ্গলগ্রহে পদপাত,
পৃথিবীতে খাদ্যাভাব,
ক্ষুধা, মৃত্যু, হাহাকার,
কৃতিত্ব দর্শায় দাঁত।

বিশ্বের শান্তি যজ্ঞে,
মনুষ্যত্বের পুনর্বাসন
টন, টন, ঘৃতের সৎকার,
ও পাশে 'ভিয়েৎনাম'—
হিংস্র টিরেনোসোরাস্
নারী ও শিশুর চিৎকার।

নাইট্রোজেন প্রতিভা

পাষাণপুরী, প্রাণহীন স্তব্ধতায়,
শূন্যে ঘোরে বাতাসের ঘূর্ণিজাল,
পাহাড়, নদী,—রুক্ষ-কাঁকব পায়ের নীচে
বেঁচে আছে হনন করে ভীষণ কাল।

রাজকন্যে ঘুমিয়ে আছে পালঙ্কেই ?
রাজপুত্রের ছোঁয়া লেগে ভাঙবে ঘুম,
আসবে কবে সোনার-কাঠি নিয়ে হাতে।
বৃষ্টি কাঁদে অঝোর ধারে একতারাতে।

কারা এলো সদলবলে, কৌতূহলে
দেখ্‌লো চেয়ে—বাঁশের আড়ে দুল্‌ছে শাড়ি,
শিশুর হাতের খেলনাগুলো ধুলোর 'পরে ;
পত্র লেখা মেয়েলী ছাঁদে,—বইয়ের ভাঁজে
রেখেছে কোনও প্রিয়তম,— দূরপ্রবাসী
ব্যস্ত যখন বিষমভার নিবিড় কাজে।

কুঁড়ে ঘর, ধনীর প্রাসাদ পাশাপাশি,
কালোর পাশে সাদা রঙের সজল হাসি
দাঁড়িয়ে আছে বোবা ব্যথার শিকল পরে,—
সকল বিবাদ ভুলেছে আজ পরস্পরে।

কারা যেন ফিসফিসিয়ে বললো কথা,
"দেখেছ এই মানুষগুলো কেমন বোকা,
পোকার মতো মরেছে এরা যুদ্ধ করে।

—দুখের সঙ্গে স্বীকার করি শেষ বিচারে
মানুষ ছিল যদিও বুদ্ধি-শ্রেষ্ঠ-প্রাণী,—
অর্থ-মিথুনতা-রোগে ঘোরোন্মাদ,
প্রমাণিত পরস্পরের ব্যবহারে"।
তারপরেতে মুখ ফিরিয়ে পাহাড় পানে,
বললো হেঁকে—"ব'লো আমরা এসেছিলাম,
তোমরা শুধু রইলে সাক্ষী, গ্রহান্তরের
প্রাণী আমরা,—মর্ত-ভূমের আগন্তুক,
পৃথিবীতে আসব আবার মানুষ পেলে।"

পাষাণপুরী, প্রাণহীন স্তব্ধতায়,
শূন্যে ঘোরে বাতাসের ঘূর্ণিজাল,
পাহাড়, নদী—রুক্ষ-কাঁকর পায়ের নীচে,
বেঁচে আছে হনন করে ভীষণ কাল।

নতুন বছরে

সময়ের "ব্লটিং-পেপার'
মুছে নেয় জীবনের গ্লানি,
যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, জীবন মুছে নিয়ে তাকে
পুষ্ট হয়, খাদ মেখে উজ্জ্বল খনিজের বুকে ;
—অর্ধেক বেদনা আর অর্ধেক কল্পনার সুখে।

পৃথিবীর মনে সেই আশা

পৃথিবীর মনে সেই আশা,
কবে এসে বেঁধেছিল বাসা—জাগিয়ে পিপাসা ;
বলেছিল ডেকে—'আছি আমি
জীবন ভরাবো তোর তাড়িয়ে হতাশা'।

সেই বাণী আজো ঘুরে ঘুরে
শোনায় মোহিনী মায়ায়—'আছি আমি
জীবন ভরাবো তোর তাড়িয়ে হতাশা'।

সেই ভাষা আজো জ্বলে
আকাশের তলে, শীর্ণ নদী জলে,
শীতের কুয়াশা মাখা,
পাহাড়ে অরণ্যে—মানুষের মনে,
—রোগে, শোকে, ব্যর্থতায়
ক্ষুধার বীভৎস ছায়ায়, আঁধারের কোণে।

এবার তবে বন্ধ হোক

ঢের তো হলো বলা
এবার তবে বন্ধ হোক
অনেক হলো চলা
এবার তবে সাঙ্গ হোক।

হৃদয়টাকে রেশমি রুমাল
বেঁধে, বাক্সে রাখি তালা এঁটে :
উই ইঁদুরে কাটবে না আর
থাকবে ভালো, থাকবে সুখে।

কী হবে আর খোলা মাঠে
ফেলে রেখে—
প্রাণ জ্বালানো সেঁকা সয়ে
—পুড়িয়ে চুর—শীতলতায়
হিমের মধ্যে জমে আতুর :
আবার কেন ? ঢের তো হলো ?

প্রেমের গলা গোবর জলে
মন নিকিয়ে,—অশ্রু-আতর
অম্বুলেপন শুকিয়ে গেলে,
গন্ধটুকু ধরে রাখা গোবরের,
—তাও তো হলো ? আবার কেন ?

দেয়া-নেয়ার পর্বটার
হিসেব কষে—শূন্য ছাড়া
আর কি পাই—দেবার ঘরে
সবই খরচ—জমার ঘরে

কিছুই নাই ;—এবার তাই
বন্ধ হোক এই বলায়
এই চলায়।

ভালোকথা বল্‌তে গিয়ে
মন্দ শুনে অন্ধকারে
হেসে ওঠা পরিহাসে,
—অন্ধকার উঠলে হেসে
মনের মধ্যে ডুক্‌রে কাঁদা—
তাও তো হলো,—আবার কেন ?

পরের জীবন আপন ভেবে
আলিঙ্গনে—নখের খোঁচায়
বুকের ছাল বিদ্ধ হলো ঃ
তাও তো অনেক দেখতে হলো।

কী হবে আর হিসেব কষে।
বাল্যকালের স্মৃতি-জ্বলা—
এ্যাল্‌বামটার ঝাপ্‌সা ছবি
বুকের আগল তুলে দিয়ে
দেখি তবে ঘরে বসে।

দেরি হলেও

আমি ডেকেছি তাকে কুকুর বলে
পাঁকে-মজা মনুষ্যেতর,
নরকে পচা অপদার্থ
কৃমি-কীটের বংশধর।

চিরদিন তাই এড়িয়ে গেছি
পাছে দুরাচার ছায়া ফেলে
শরীর আমার অপবিত্র
করে বুঝি বা কাছে গেলে।

আজকে আমি সেবাব্রত
নিয়েছি তার রুগ্নতায়!
আঠার ঘণ্টা পরিচর্যায়
মনোহরণে প্রাণান্ত—
ভাঙবো খলে বৈরিতা
করেছি শপথ একান্ত।

এখন যদি আদেশ আসে
জুতো জোড়া তার ঝাড়তে হবে,
মেঝের পরে জমানো থুতু
দু'হাত ভরে কাচ্‌তে হবে,
তাতেও আমি তৈরী, কারণ

—দেরি হলেও জেনেছি সত্য
লোকটি যদিও জানোয়ার
তথাপি তাঁর গোপন-জীবনে
'হার্ড-ক্যাশ নয় উপেক্ষার।

অ-সা-ধা-র-ণ

মোটা মোটা লোহার গরাদের ভিতরে
পাগ্‌লা পৃথিবীটা ঘুরপাক খাচ্ছে।
আকাশের শিকায় ঝুলছে খাঁচাটা ;
যেমন পাখির খাঁচা শূন্যে ঝোলে।
অনন্ত শূন্য, শূন্যের ভিতরে, বাইরে, চারপাশে,
একটানা বাতাসের আর্তনাদ, যেন কোন
গ্রহান্তরের কবরখানা থেকে ভেসে আসছে,—
সঙ্গে চিম্‌সে মাংসের গা ঘুলানো গন্ধ ;
কিছু শুক্‌নো হাড়ের ঝন্‌ঝনি
শোনা যায়, অশরীরী নারীর হাতের মতো।

পাগলা হাস্‌ছে, কাঁদছে, মাঝে মাঝেই গুম্‌,
গম্ভীর—যেন জীবন জিজ্ঞাসার সার্থক
সদুত্তর, নগদ কিছু পেয়েছে তেমনি উদার, দার্শনিক
নির্লিপ্ত এবং আত্মতৃপ্ত।

মাঝে মাঝে গরাদের গায়ে দাঁত বসাচ্ছে,
দেখ্‌ছে লোহাটাতে কিছু সোনার কণিকা
পাওয়া যায় কি না—আর কিছু না হোক
লম্বা লম্বা ছুঁচ্‌লো নখগুলো সোনার জলে
ঝালিয়ে নিতে পারবে অন্ততঃ তখন নিজেকে
সর্বেসর্বা স্বর্গীয় রাজা ভাবতে ভাবতে
পাগ্‌লা অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ছে এবং
মাঝে মাঝে উঠে গায়ে চিম্‌টি কাট্‌ছে
দেখ্‌ছে ঠিক ঠিক বেঁচে আছে কি না।

হাতের গুলিটা টান টান, পাগল দরজা
ঝাঁকাচ্ছে। মজুদ স্বাস্থ্যের ওজন দরের
সমীক্ষা চালাচ্ছে, চোখহুটো পলাশের মতো হাস্‌ছে।

প্রচণ্ড ঝড়, বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে, কালো কালো
ধুলো উড়্‌ছে, প্রবল ঝাপ্‌টা মার্‌ছে—খাঁচাতে।
দুল্‌ছে খাঁচা—পাক খাচ্ছে, পাগ্‌লা হা,— হা, হাস্‌ছে—
—জবর টেক্কা দিয়েছি কিন্তু—সেই বেটা স্রষ্টাকে।
এমন মজবুত আশ্রয়, এমন সার্থক পরিশ্রম
আমার বিজ্ঞানের, শিল্পের কলাকৌশলের—
—আর আমার এই বুদ্ধির, ঘিলুর কী রকম
স্বাভাবিক, কেমন সুন্দর, আশ্চর্য, অব্যর্থ, অ-সা-ধা-র-ণ।

কোন মুকুরে

অন্ধকারের পিছনে অন্ধকার,
আলোর পিছনে আলো ;
আলো আর অন্ধকারে
এই বিশ্ব মন্দ কি ভালো—
আমরা বুঝি না কিছু।

আমাদের ছুটে চলা অন্ধকারে—
কখনো বা আলোর পশ্চাতে।
আবার আঁধার হতে আলোকে—
আলো হতে আঁধারের স্রোতে।

সহসা যদি আলো আর অন্ধকার
একাকার করে দাও তুমি,
কিংবা আলোক-আঁধার শূন্য
নিস্তরঙ্গ সরল রেখার 'পরে
আমাদের আত্মাকে দাঁড় করে
দাও—তবে বিশ্বের নিষ্ক্রিয় বর্ণহীনতায়,
আমাদের চোখ হবে অন্ধ—চেতনায়
কুয়াশার মতো আদিম তমসা
যাবে জমে : বিবেকের বিবর্ণ হাত
তখন কি তোমাকে পাবে খুঁজে
গতিহীন হৃদয়-সমাজে ?

অন্ততঃ শেষ প্রস্থানের পূর্বে
আমাদের শূন্য-গর্ভ অহংকার-
বুদ্ধিকে—বলে যেও— কৃপা করে
—কোন মুকুরে আমাদের সাম্প্রতিক
আত্মার অভিনব মুখ দেখবো ?

তুমি

তুমি তো লুকিয়ে আছ
আমার রক্তের ভিতরে সত্তার গভীরে,
তবু তো পাই না তোমাকে আপন অন্তরে ঃ

তুমি প্রতিটি ফলের বৃন্তে বীজের আধারে
ধরে আছ শাশ্বত হাতে নির্ভর গতি।
আবার মৃত্যু-অনুকম্পায়ী তোমার মতি
ছন্নছাড়া বিষাদের নদীকূলে, যেন রুক্ষ
নেড়া গাছ নির্লিপ্ত দাঁড়িয়ে ;

পাখিদের আশ্রয়স্থল—শ্যামলতায় তবু
অনুদার,—সন্ধ্যার বিবর্ণ আঁধারে দুই হাত
তুলে বলো তুমি—'সরে যাও, সরে যাও,
এখানে এসোনা কেউ,—শুধু এক কাঠুরিয়া ছাড়া'।

কিন্তু যদি কুটিল-কুঠারে তোমাকে কাটি
সে তো আপন তনুচ্ছেদ—তার আগে বলো,
—রচনা করি আমাদের নির্মম কবর,
যেহেতু যেতে হবে সেইখানে
দু'জনা একসাথে।

সাম্প্রতিক বেঁচে থাকার নিসর্গ

হাত খেলিয়ে আর কতোদিন
চলবে এই জীবন,
এই গুনটেনে নৌকোতে চড়া ?
ট্যাঁকেতে টাকা নেই পুরুষের,
সে তো সোমত্ত বিধবার মতো।
রূপ বলো, জলুস বলো—ভরা যৌবন—
জমি-জেরাত সবই আছে মজুত,
তবু তো হা-হুতাশ কী যেন নেই
সব ফাঁকি—সবই ফক্কিকার।

মাটি টাকা—টাকা মাটি,
খুব সত্যি—খুব খাঁটি,
তাই আমাদের মাটির টাকা—
আর সঙ্গে সঙ্গে জীবনটাও।
ভাগ্যে যেটুকু ছিঁটে ফোঁটা ঝরে
সে তো মাটির মূল্য, বাজার-দরে।
অতএব সাষ্টাঙ্গে মাটিতেই শুই,
আর মনে মনে প্রার্থনা জানাই
হেই ভগবান পিতৃ-পুরুষের মান রেখ
মাটিতে বেঘোরে গোর দিও না।

সব কথা কি শোনেন ভগবান,
বোধ হয় না, দিনে দিনে তাই আমসি
হই, না খেয়ে হরেক রোগে ভোগে।
পুত্র, কন্যা, কলত্র নিয়ে সংসারের
মস্ত বজরাটাতে বিস্তর ছেঁদা।

ঋণের জল ছলছলিয়ে ঢোকে,
শেষে একদিন সখাত-সলিলে।

এই তো আমাদের সমাজের ছবি।
এ জন্য রং-তুলির প্রয়োজন নেই,
চোখ দুটো খোলা রাখলেই হলো,
দেখবে হাটে, মাঠে, গাঁয়ে, গঞ্জে,
শহরে, বন্দরে এক-জাত চেহারা
চলেছে মিছিলের মতো সারবন্দি
এবং তুমি আমি সবাই তাতে সামিল।

অথচ যদি বিপ্লবের কথা তুলি
অমনি হাত-পা সেঁধোবে পেটের ভেতর
বুক ঢিস্ ঢিস্, শরীরে কাঁপুনি
ঝিন্ ঝিনিয়া বুঝি ঝেঁকে ধরলো,
'কী জানি বাবা, কোথাকার জল
কোথায় ঢলে।
ছানা-পোনা নিয়ে বেঁচে-বর্তে
আছি, কোনমতে শান্তি-স্বস্ত্যয়নে'।

তবে তোরা সবাই যেমন আছিস
তেমনি থাক, আর মিথ্যে পড়ে পড়ে
মার খা,—
ঐ হাড় জির্-জিরে অস্থি-সার
খোঁটাতে বাঁধা মরা গরুটার মতো।
তারপর একদিন ধুঁকৃতে ধুঁকৃতে
ধপ্ করে মুখ থুবড়ে পড়বি
আর নট্-নড়ন-চড়ন।

অথচ কী না হতে পারতিস তোরা,
আজ আরাম-কেদারায় বসে বসে
কষে মৌজ মেরে পায়ের উপর
পা তুলে দিয়ে দু' তিন পুরুষ
হেসে খেলে যেতিস্‌।

কিচ্ছু না পারিস তো চুরি ধর,
ডাকাতি, বাটপাড়ি, খুনখারাপি,
একটা কিছু কর।
এই দিনে রাতে রক্‌-পেঁয়াজি ছাড়্‌।
ছুক্‌রীর পেছু পেছু চুট্‌কি কাটা
টীকা-টিপ্পনীতে কাজ কি বাবা ?
আর কি হবেই বা লেখাপড়া দিয়ে,
ডিগ্রী নিয়ে—
সবাই বেকার থাকবি, সব্বাই বেকার।

তার চেয়ে আয় একবার লড়াই করি
ঐ বুর্জোয়াদের মুখোশ খুলে দি,
রাম-ছাগলের ছাল-চামড়া ছুলি,
মাথার খুলিতে গেণ্ডুয়া খেলি,
ঘরে ঘরে আগুন লাগাই—
ট্রাম পোড়াই, মোটর, বাস ভাঙি,
কল-কারখানা, স্কুল কলেজ
বয়কট করি।
দোকান-পাট জাহান্নামে যাক্‌
ঘেরাও করে ঘুঘুদের সঙ্গে
বাঘ-বন্দি খেলি।
ব্যাটারা বুঝুক সে জমানা নেই।

দিন বদলেছে,
এবার হাত বদলের পালা।
আমাদের মুঠিতে এলো বলে—

হাত ঝাড়লেন মুখুজ্জেদা—
সিগারেটের ছাই উড়লো বাতাসে,
কিঞ্চিৎ আগুনের লাল ফুল্‌কি
আমাদের জামা-কাপড়ের জঞ্জালে।
মুখুজ্জেদা দামী—ভার্জিনিয়া খান
অনেকদিনের অভ্যেস কিনা!
ফাট্‌কা বাজারে লড়াই করে করে
বেশ টু-পাইস জিতেছেন তিনি।
মোটা জোত-জমার প্রচুর আয়,
রাজনীতির ব্যবসাও ভালোই চল্‌ছে।
সবি তাঁর এক জীবনের কৃতিত্ব
আমরা তাই শ্রদ্ধা করি তাঁকে।

কিন্তু আর নয়, রাত অনেক হলো,
এবার বাড়ীর পথে পা।
মুখুজ্জেদা আমাদের দুর্লভ ব্যক্তি।
কাজের মানুষ আসল কথাটি
বেশ গুছিয়ে বলতে জানেন তিনি।
সত্যি বল্‌তে কি মনে হচ্ছে.
ত্রিশ-ইঞ্চি বুকটা দেখতে দেখতে
বত্রিশে বেড়েছে—বেশ স্পষ্টভাবে
বুকের ওপরে হাত বুলোলে
ধরা পড়ে।

নিজেকে প্রচুর বলবান ভাবতে
ভালো লাগছে।
তবু বাড়ীতে তাড়া আছে যেহেতু,
আজকের 'মেনুতে' বেগুন-কা-কাবাব
আর ঠাণ্ডি-পোলাওয়ের বিলি-ব্যবস্থা
অর্থাৎ পান্তাভাতের দোসর বেগুন-পোড়া,—
বেশি দেরীতে গেঁজে যাবে।
সঙ্গে আছে মশারি সেলাই-এর পালা
আর মশাগুলোও হয়েছে আচ্ছা বেত্‌মিজ্‌
পাজির-পা-ঝাড়া, ধেড়ে বজ্জাত
ঠিক যেন ঐ বুর্জোয়াদের মতো।

নিগূঢ় তত্ত্বকথা

তথাকথিত
কবি :—আজ এ বসন্তের রাত
হবে কী ব্যর্থ বরবাদ,
চাঁদ কি ফিরে যাবে বাড়ী,
নিদারুণ খেদে।
এই মুকুলঝরা মত্ত হাওয়ার গানে,
এসো সুর মিলিয়ে খুঁজি জীবনের মানে,
রবীন্দ্রনাথ আর কালিদাসে কেঁদে।

তথাকথিত
রাজনীতিক :—তুমি থামো হে কবি, ভিয়েৎনাম ভরা ডুবু ডুবু
অতলান্ত অন্ধকারে সভ্যতা আজ জীর্ণ জবুথবু—
বার্ধক্যের মরণ দশায় —এ সময় কি কাব্য শোভা পায়

আনো ক্ষাত্র তেজ বুকে, অন্যায়ের বেসাতিকে
অন্যায় দিয়ে আর তুড়িও না সুখে।
কবিতার প্যানপ্যানানির সুস্থ সময় এ নয়;
তাই যদি কাঁদতেই হয়,—তাহলে এসো সমবেত
বুক চাপড়াই নিপীড়িত দুঃখে।

তথাকথিত
ব্যবসায়ী :—এ সব অবশ্যই সত্য, তবুও সত্যের সমীক্ষায় জানো,
সব কিছুর পশ্চাতে আছে ব্যবসায়ী মন,—তা মানো?
তাহলে ভেবে দেখ বন্ধুগণ,—মার্কিনেরও তাড়া আছে
নাক গলাবার,—হ'লই বা সে সাত সমুদ্র পার!

সবার উপরে টাকার দাম—যা দিয়ে বাঁচবে বাপের
নাম,
নীতি কথা, কা'কথা পরে বিচার্য বিষয়।
তাই যদি আলোচ্য কিছু থাকে এ বাসন্তীরাতে
তবে এসো কী ভাবে দুনিয়াটা বাঁচে এবং—
তুমি, আমি যাতে—

তথাকথিত
খেলোয়ার :—"আরে ছোড়ো," "মারো গোলি," জীবনকে চাঙ্গা করো
আগে।
শরীর সবল হলে হবে উপভোগ যা' যা' পাবে
তোমাদের ভাগে।
দিল্ সাফ্ চাই, নাকে কেঁদে নারীর মতো কোন লাভ
নাই।
কিংবা কুসীদজীবীর মতো টাকার সুদ কষে ভাই,
জীবনটা দিয়ে বরবাদ। তাই বলি এসো—
খেলার খবরে জ্বলি হিংস্র-উল্লাসে।

সমাজপিতা :—আমি সবই শুনেছি কানে তোমাদের তর্ক-বিতর্ক
দরজার ওপার থেকে দাঁড়িয়ে সতর্ক, নিশ্চুপ
দেয়ালের পাশে।

এখন দেখছি তোমরা নিরেট গবেট।
যদি কোন আলোচনা পেতে চাও হাতে
এ মধুৎসব রাতে।

—গভীর ভাবনার বস্তু, নিগূঢ় তত্ত্ব, জীবন-জিজ্ঞাসা,
তবে সব ছেড়ে দিয়ে চলে এসো পরচর্চা করি,
পরনিন্দা তো দোসর তার—আনন্দের কড়ি।
এসো এই চৈতীর চাঁদ্‌নী রাতে, আলবোলা নিয়ে
হাতে,
চুলকাতে চুলকাতে দাদ,—সেই কাহিনীটি কব্জা করা
যাক্।
সেই যে ঢলাঢলি করেছিল একদিন এ পাড়ার
এ্যাংগ্‌লো ছুঁড়ি,
ইছাপুর কারখানার ছোক্‌রা এক সাহেবের সাথে,
দেখেছিলে বোধ হয়, ওর ব্লাউজের বোতাম জোড়াটা
যথেষ্ঠ ছিল না আঁটা, কোমরের দিকটাতে ছিল খোলা-
মেলা।
ওর নিতম্বের ঢেউ, বুকের ছলুনি, কাঁচ-পোকা-চাউনির
পাকে,
বেড়ালের মতো থাবা মেরে ঘায়েল করেছিল যাকে,
সেই ছোঁড়া এসেছিল ফের একাদশী পারণের রাতে—
(সিদ্ধান্ত মতে)—
সাতটা সাতাশমিনিট সাত সেকেণ্ড গতে।
এও জানি আমি—

ওর মায়ের চৌদ্দ-ক্যারেট্ ব্রেস্‌লেটে আরো কিছু ছিল
ভেজালের খামি।
আহা! ব্যস্ত হয়ো না সব, এখনও আরো কিছু আছে
বলবার বাকি।

এ পাড়ার রাণী ধোপানী,
জানো নিশ্চয়ই সেই যে চপল চতুর মুখখানি
সরের সাথে চিনির আঁশের মতো, একটু যেন 'ইয়ে'
গোছের ছিল,
তার নয়নের নাগর ননীচোরা
কাল রাত সন্ধ্যার ঘোরে,—বেপাড়ার নম্বরী কোনাচে
ঘরে,
দেখেছে সে 'বাপের বিয়ে'—পয়লা প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত
দিয়ে।
রাতটা কার কব্জায় থাকে, এই নিয়ে জেদাজেদি ছিল।
শুনেছি আজ হাসপাতালে তার সতেরটা সেলাই
লেগেছে।

সবচেয়ে দুঃখের কথা ভাই তোমাদের বলি—
আমার বিধবা ঝি ছুঁড়ি কাল থেকে আসে নাই ফিরে।
শুনলাম ও পাড়ার হরিদাস গোঁয়ারের সাথে, হেসে
হেসে গেছে ভেসে।
এখনও পাইনি খবর, সাময়িক কি জন্মের মতো।
দেখেছ তোমরা কী মুশ্‌কিলে ফেলেছে আমাকে!
গায়ে গতরে ছিল বেশ, দেখতেও খাসা ছিল ছুঁড়ী,
আর সব চেয়ে ঠাসা ছিল মধু, তার নরম দুহাতে।
আর পিঠের মাঝখানটাতে, ছোট্ট লাল জড়ুলের জাল
ধিকি ধিকি জ্বলে হতো সারা,—

সাদা সিগেরেটের মুখে টুক্‌টুকে ফুলকীর মতো।
শুধু ছিল না জানা, পেটে পেটে ইস্‌কুরুপের
এতো প্যাঁচ ছিল।
আজ ওর কোমরের কষির ফুলশর দাগ
আমার গলাতে যেন ফাঁসি হয়ে,—
বিদ্রূপের দড়ি সেঁটে দিল।

সমবেত ঃ—অহো! গুরুদেব, কী কথা শুনালে আজ তুমি,
সার্থক আমাদের কান, মন, প্রাণ,
সার্থক এই বাসন্তী ঋতু সমাগম।
আজকের রাত কখনো ব্যর্থ নয়—স্থির নিশ্চয়।
ধন্য ধন্য এ রাত রসে ভরা মালপোয়ার মতো।
কিন্তু কী কঠিন দায় দিলে গুরুদেব আমাদের কাঁধে।
আজ সব কিছু ফেলে দিয়ে, পবিত্র কর্তব্যভার
নিতে হবে তুলে, এক সাথে।
এসো ঐ চাঁদনীকে সাক্ষী রেখে আমরা প্রতিজ্ঞা করি
একত্রে রুখবো এই স্বৈরী অনাচার—
আমাদের পাড়ার সুনাম—নারীত্বের নাম।
এই ঝিরি ঝিরি লিচু মুকুলের বনে,
ঘেঁটু ফুলের গন্ধে গন্ধে মেতে,
বাতাসের সুড়সুড়িতে উত্তেজনায় তেতে
আমাদের সলা হোক এক ভীষণ শপথ—
যেন নির্দয় হৃদয় নিয়ে পরচর্চা পরে,
শাস্তির কঠিন বিধান নিতে পারি তুলে,
এবং সফলতা শেষে, আর কোনদিন যা'তে
ভয় না পাই, সত্যের সম্মুখীন হ'তে,
হোক না সে যতোই ন্যক্কার নোংরামির বাড়

'কেচ্ছার পাঁকে পাঁকে ডুব দিয়ে দিয়ে,
করে যাব পদ্ম-উদ্ধার।

মহৎ-প্রাণতা

মানুষের মহৎ-প্রাণতাকে আমি আর একবার,
ফিরে পেতে চাই, এ জন্যে কার কাছে যেতে হবে বলো ?
ঈশ্বর, সমাজবেত্তা অথবা দার্শনিক ,
আমি তাঁদের প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে যাব,
করজোড়ে জানাবো একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষার কথা—
'মানুষের মহৎ-প্রাণতাকে তুমি আর একবার,
ফিরে দাও প্রভু,—আমি তোমাকে দাসখত লিখে দেব'।

তুমি ফিরে পেতে দাও সেই সব সজীব-প্রাণতা,
উদার সমুদ্র, কলকল ধ্বনিতে যার রোমাঞ্চ জাগে,
সুরেলা বাঁশির মতো মর্মকোষে,
বিহ্বল আবেশের, বিপুল জোয়ার বয়ে আনে।
অবগাহনে পরিতৃপ্ত প্রাণ, বার বার শুচিতাঁকে
ফিরে ফিরে পায়।
কোথায় সে সচল-কায়—গানের গঞ্জন,
পাষাণ শতাব্দীর ধূলিধূসর সৈকত-তটে
মরে মাথা কুটে। আজ দেখি সমাজের
স্তম্ভের আড়ালে আব্‌ডালে, বানিয়া, আইনজীবী,
রাজনীতিবিদ্‌, দারোগার চোরামুখ মুচ্‌কি হাসে।
তাদের ধূর্ত-চোখের প্রতিভাসে, আসামী, মক্কেল,
আর দাবার ঘুঁটিগুলি, ক্রমাগত হাত বদ্‌লায়।

ল্যাম্পপোস্ট, ঘরের দেয়ালে, সেইসব প্রতিকৃতি কাঁপে।
তীক্ষ্ণ অন্বীক্ষাতে দেখ সেবক সাহিত্যরথী,
বিশ্রুত সঙ্গীত সাধক, বিজ্ঞ-অধ্যাপক,—
লোকতঃ বিখ্যাত এই সব দিক্‌পালেদের
মুখের মসৃণ কোমলতা, বাস্তুঘুঘু ঘোড়েল-শেয়ালের
উজ্জ্বল রেশম-তির্যক-চতুরতা আনে।

তুমি পতঙ্গের মতো আফ্রিকান পাতাবাহারের ঝাড়ে
বাড়িও না হাত, অথবা নির্জীব গাছের শিকড় জেনে,
অজগরের শরীরী-আসনে উপবেশনে ক্ষান্ত হও।
নাহলে মুহূর্তের বিশ্বাস, ঘাতকের হাতে
শ্বাসরুদ্ধ হবে।
কিন্তু কষ্টে তোমার পার্শ্বচর উদ্ধার-ব্রত-বিমনা
আকুল কান্না কৌতূহলী দৃষ্টির ত্রিশূলে
পলে পলে বিদ্ধ হবে।
সেই সব তথাকথিত মনীষীদের সম্মোহন দৃষ্টির ফাঁদে
মাথা দিও না ; সরল হৃদয়-গ্রামে
অপমৃত্যুর দুর্নিবার হানা।
লক্ষ্যকর কী করে ধীরে ধীরে সাপেরা
খোলস ছাড়ে
সতেজ চোয়ালে লক্‌লকে জিভ উঁকিমারে।
কিন্তু অনেক দেরী করেছ বন্ধু,—ততক্ষণে,
তোমার সর্ব-অঙ্গ, বুদ্ধি-সত্তা, ব্যক্তিত্ব—
ধার দেনাতে বাঁধা-বন্ধকী দিয়ে,
যথাসর্বস্ব দেউলিয়া-মাল, নিলামে তুলে দিলে।

এ যুগে কোন মানুষ মিলবে না,
এ কথা জেনে, যদি তুমি প্রতিটি প্রতীককে
প্রিয় বলে ভাব, নিঃশঙ্ক সোয়াস্তি তবে।

যেহেতু আস্তে আস্তে তুমিও অজ্ঞাতসারে
তাদেরি দলভুক্ত হবে।
মানুষ থেকে বনমানুষের প্রতি-বিবর্তনে
তোমার বনচারী আচরণ, সামাজিক ছাড়পত্র
পেয়ে, সংসারে নির্ভীক বিচরণে পরিতৃপ্তি পাবে।
রাক্ষুসে কসাই বৃত্তি, কিংবা জান্তব-ইতরতায়,
কেউ কখনো ক্ষুণ্ণ হলো, এই সব লৌকিক বিচারে,
চর্ম-চক্ষুর লজ্জার ধিক্কারে, মনোবিকারের—
আঁব জন্মাবে না, ঈশ্বরের এই আশীর্বাদ পরিহাস,
সহজেই পেতে পার।

নাহলে আমরি মতো দ্বারে দ্বারে সাশ্রুনয়নে
কর-জোড়ে জানাও—"মানুষের মহৎ-প্রাণতাকে
আর একবার, ফিরে দাও প্রভু,
—আমি তোমাকে দাসখত লিখে দেব।"

মিলাতে পারি না

আমি মিলাতে পারি না, মিলাতে পারি না,—
আমি মিলাতে পারি না,
অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন সংকলন মিলাতে পারি না।
অতীতের অভিজ্ঞতার চাতাল থেকে আমি বর্তমানকে ছুঁতে চাই,—
ধরতে চাই, পেতে চাই আসঙ্গ সহবাসের আকর্ষ-আকাঙ্ক্ষায়।
অমনি ভবিষ্যৎ আমাকে ভয় দেখায় তর্জনী তুলে ;
কোন অনিশ্চিত, অনির্দেশ্য অনুভূতি মুহূর্তে
আমাকে স্থবির করে দেয়।

আমার সংযমের বহির্বন্মে প্রতিহত শম্বুক-মানসিকতা,
বর্তমানের অস্থির ইথরে রকেটের মতো ছুটে যেতে চায়,
কারণ গতির মুহূর্ত-ত্বরণ সুস্থিত হতে দেয় না আমাকে
তড়িৎচুম্বক যেন পশ্চাৎ-পুচ্ছে মহাকর্ষ করে।
দ্রুতচারী যন্ত্রযানের মতো আমি যখনই চলমান,
অমনি ভবিষ্যতের সংকেতবহ তীক্ষ্ণ থাবার মন্দনাঘাত
ছুঁড়ে ফেলে বর্তমানের তরঙ্গ সঙ্কুল সমুদ্র সংশয়ে,
সেখানে অতীতের নিঃসঙ্গ ভাসমান দ্বীপ আমাকে বাঁচাতে ব্যগ্র।

বার বার বৃত্তের বর্তুল পথে মিথ্যা পরিযান
তাঁতের মাকুর মতো নিত্য আসা যাওয়া,—
আমাকে ক্লান্ত করে, ক্লান্ত করে, ক্লান্ত করে।
এ কী দুঃসহ দাহনে আমার সত্তা নিয়তির মতো হয়েছে হত,
এ কী প্রগল্ভ মায়ায় বহির্মুখ আমার পৃথিবীতে দ্রুত পথ হাঁটে,
এ কী ভয়ানক ভবিষ্যতের ভয়ে স্থির ধর্ষকামী আমি।

আমি মিলাতে পারি না, মিলাতে পারি না,
আমি মিলাতে পারি না,
অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ তিনমন্ত্র একসাথে সাধতে পারি না,
সাদা, কালো, লাল—তিনটি বর্ণ এক পটে পারি না ফুটাতে ;
জরিষ্ণু দীর্ঘশ্বাস, যুবকের বিশ্বাস সংশয়, শিশুর সারল্য,—
পারি না মিলাতে।
তাদের শব্দের বুদ্‌বুদ্‌ সকরুণ বাতাসের সাথে,
হাহাকার করে লোটে স্তম্ভিত বিশাল বৃষ্টিতে।

অতীতের বেগুনী বাসনার 'পরে বর্তমানের বিচিত্র-বর্ণালি,
বর্তমানের অস্থির সংশ্লেষণে ভবিষ্যতের আলেখ্য-সন্ধান,
স্থবির সংস্কারের বিবর্ণ আয়নায় নূতনের অলোক-দৃষ্টি।
সে দৃষ্টির মোহাচ্ছন্ন ধূসর ধূলিতে ভরা তৃণ,
একদিন উড়ে যায় কালের প্রান্তরবাহী ছুটন্ত অশ্বের খুরে।

আমার সংস্কার চায় অতীত প্রত্যয়।
বর্তমানের কালো পথ ধরে বাস্তবতা-বোধ
এগিয়ে চলে দিগন্তে লাল সূর্যের দিকে,
কিন্তু জ্বলন্ত চোখ শার্দূল যেন আমার সত্তাকে অচেতন করে—
দূরান্তে তির্যক বিপদ সংকেতের মতো,
বার বার লাল নিশান নাড়ায় মধ্যপথে।
এ কী দুরদৃষ্ট, এ কী দুর্বার বাধা ;
সাহস সংস্কার মুক্তি—বিশ্বাস আর ধূর্ত ভীরুতার,
শিক্ষা, শুদ্ধি, নৈবীর্য, নৈতিক অনৈতিকতার
এ কী আশ্চর্য অদ্ভুত, আত্মঘাতী মিথস্ক্রিয়া।

নীলের পরিণতি লালের পথ ধরে চলে,
কালোর গর্ভে লালের সন্তান ইশারা।

মহাশূন্যে নিলীয়মান শেত-শয্যায় দিনের মরণ।
ব্রহ্মার নাভিপদ্মের বিস্ফারে বিশ্বসৃষ্টি হাসে,
বিষ্ণুর নীল পদতলে কম্পমান স্থিতি,—
দ্রুত ধাবমান শিবের সংহারক হাতে।
আমার ব্রহ্মসত্তা বিষ্ণুর পদতলে আশ্রয় চায়,
তথাপি আমার বোধ শিবের সংহার-সচেতন।
কিন্তু রুদ্রের ত্রয়ী রক্তচক্ষুতে পরাভূত আমি,
তাই বর্তমান আমার কাছে সব চেয়ে প্রেয়—সব চেয়ে শ্রেয়—
নিশ্চিন্ত, নিরাপদ মোহ, আফিংয়ের মতো তিক্ত-মধুর।

আমার অতি-বেগুনে সংস্কারগুলি অবলোহিতের দিকে বেগবান,
কিন্তু বিচিত্র এলোমেলো মধ্য-বর্ণালীরা পথ আগলায় ;
তারা বিশৃঙ্খল, অস্থির, অস্পষ্ট ধূসর-পিঙ্গল।
যতোবার দোলকের সমান্তরাল পথে অভিযান করি,
বর্ণচ্ছটার উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গরাশির সমাহৃত শব্দ,
আমাকে ঘনীভূত মৃত রাত্রির অন্ধকারে ঢাকে।
আবার অস্থির-সত্তা রাশি রাশি পতঙ্গের মতো,
ধেয়ে চলে অগ্নিগর্ভ লোহিতের অমেয়-আভায়।
অমনি প্রতিসারী, প্রতিহারী হুঁশিয়ার হাত
প্রচণ্ড বেগে নির্বিকার বিকর্ষণ করে—
অতি-বেগুনের প্রচ্ছন্ন-ছায়ায় আমি সান্ত্বনা খুঁজি।

কে আমি, কে আমি—উদাত্ত, অনুদাত্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করি,
তুই কি ভৈরবের তন্ত্র-সাধনের গলিত শব—অথবা বলি,
তুই কি কালের হাহাকার অট্টহাসিতে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ শিশু!
তুই কি কবন্ধ বধির—
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌হীন কেতু।
অথবা সমাজের পরজীবী জীব-জনি সকাম-নির্বীজক।
তুই কী ঘরহারা বাউলের মতো পথে পথে বেঁধেছিস ঘর,

অথবা আত্মভোলা দার্শনিক যেন নিঃসঙ্গ নির্জন
আত্মরতি তৃপ্তি সুখে সমাধিস্থ, সংসার বন্ধনহীন আত্ম জিজ্ঞাসায়।

"হায় 'নিউট্রিনো' তুমি কখনো দর্পণে মুখ দেখ নাই।
তুমি আছ অথচ নিজ অস্তিত্ব-অচেতন।
তুমি কর্মী অথচ নৈষ্কাম-সুখী,
তুমি অনিবার্য আত্মবিস্মৃত-বোধি।
তুমি সর্ব শুভ অশুভের ঊর্ধ্বে উদাসীন আলো,
জল, স্থল, অন্তরীক্ষে সর্বচারী তুমি।
যখন মহাজাগতিক রশ্মি 'নিউক্লিয়াসের' কেন্দ্রে
আঘাত মেরে মেরে তোমাকে খুঁজে মরে।
তখন নিউট্রন, ইলেক্ট্রন প্রোটনের সমবেত সংঘাত ঝংকারে
তোমার ঘুমন্ত-চেতনা নিজেকে করে আবিষ্কার—
আর সেই মুহূর্ত-জাগরণ-পরে ঘরছাড়া ঘোষকের ডাক,
তোমাকে অস্থির বেদনায় মহাবিশ্বে নিয়তির মতো টানে,
তুমি উধাও হও সর্বস্ব-ত্যাগের পুলকিত কামনায়।

বলো 'অণু' কে তুমি আমার ?
আমার আত্মা, চেতনা, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি অথবা বিবেক,
অথবা সংস্কার, মানসতা, কিংবা অস্মিতা ?
তুমি-হীন আমার চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে
যাযাবর পাখীরা গায় গান।

বুঝেছি আজ, তোমার বিদেহী-আত্মা নিশ্চিত,
ছড়িয়ে রয়েছে সারা বিশ্ব-সমাজে,
আমার অস্তিত্ব খোঁজে তোমার সঙ্গম—
মহাবিশ্বের পালঙ্ক-শয্যায়।
সে রাতের ফুলশয্যায় তুমি আমি
পরিপূর্ণ হবো ধ্রুব-প্রত্যয়ে।

সময়ে সন্তানও অসহ্য মনে হয়

সময়ে সন্তানও অসহ্য মনে হয়,
ফুল, ফড়িং, পাখি—ফিচেল ফ্যাসাদ।
আলোর লাবণি তপ্ত লৌহশলা,
তেতো লাগে লোভনীয় মিষ্টির স্বাদ।
এমন কি বরবর্ণিনী রতি-রমণী—
তাদের চোখের চিকনাভাস, ললিত-কপোল কেশপাশ,
কাঁচুলির চমৎকার রেখার সমাহার,
যা কিনা অন্য সময়ে অনন্যমনে,
আরক্তিম রোমাঞ্চ আনে একান্ত গোপনে
সেও—
অহেতুক অনাকর্ষণীয় মনে হতে পারে ;
যেন গত রাতের বিষণ্ণ বাসি বড়া,
কিংবা কোয়াহীন কাঁঠালের ভুতি—
বা চশমাহীন চোখে অনস্তিত্বের শূন্য-অনুভূতি ;
অথবা নিজেকেই,
জীর্ণ-দগ্ধ ব্যাটারীর রিক্ত টর্চ জেনে,
নির্জন নিঃসঙ্গ অন্ধকার কোঠায়,
এক কোণে পড়ে থাকতে বড় সাধ যায়।

পৃথিবীকে মনে হয় নির্বাসিত দ্বীপ,
বন্যবরাহ, ব্যাঘ্রসমাকুল হিংস্র খর-ক্ষেত।
চতুর্দিক উতরোল, তরল লোনা জল,
পানীয় নাই, নিরাপত্তা নাই, অশান্তি অবিরল।
সমাজ সংসার শক্তিমানের ক্লেদাক্ত মল্লস্থল,
তাদের ঘর্ম-বৃষ্টিতে, পদলাঞ্ছিত কর্দম-বিষ্ঠাতে

আমাদের দৃষ্টি অন্ধ, দেহে আবিলতা ;
তাই স্বভাবতঃই স্বরূপে সম্ভাবহীনতা।

মায়া, মমতা, সস্নেহ উষ্ণ অনুভূতি,
দু'হাতে ঠেলে ফেলে-- কদর্য ঘৃণার সঙ্গমে,
উলঙ্গ ক্রোধ—অগ্নিতে পেট্রলে—পোড়ে যুগলে।
সীমাহীন অবসাদে অন্তর্চেতনা সমাচ্ছন্ন করে।
তাই সময়ে সন্তানও অসহ্য মনে হয়,
ফুল, ফড়িং, পাখি—ফিচেল ফ্যাসাদ।

যেহেতু জ্বরের ঘোরে সবই বিস্বাদ,
চিত্ত-বিকারে আপ্ত-বাক্য,—মিথ্যা-পরবাদ।
অথচ আমাদের প্রত্যয়িত প্রীতি ভালোবাসা,
সকল ভাবনা চিন্তন—প্রেরণা, প্রণয়
যে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে—
সেই শিশু, ফুল, পাখি, বিশ্ব-সুষমা,
জীবন-জিজ্ঞাসা,-- সত্যমূল্যের বুকে পদাঘাত করি।
কেন না মনোবিকারে দৃষ্টি বিভ্রম—অনৈতিকতা,
বিভ্রমে ঘৃণা ক্রোধ,—আত্মবৈরিতা,
বিকৃতি এই বিবিক্ত মনের অসুস্থ প্রতিভাস,
আর আবিলতাই তো আত্মহত্যা,
সভ্যতার অভিশপ্ত দুরতিক্রম্য ব্যাধি,
প্রগতির নয়া পরিহাস।

গণতন্ত্র

গণতন্ত্র তোমার হৃদয় তন্ত্রে তন্ত্রে আমি বাঁধা।
সেখানে যে সপ্তসুর বাজে, আমিও হবো এক সুর
এক বর্ণে আঘ্রাণে আস্বাদে,
আমাকেও করে নাও লীন তোমার তন্ত্রীতে ধমনীতে।

গণতন্ত্র তুমি তো সেই সভ্যতার ঋদ্ধি—শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার
তোমারি বিধান, সংবিধান—নবীভূত বেদ।
মানুষের কল্পনার তুমি শেষ শিল্প-কলা,
ক্লাসিক-সঙ্গীত এবং ললিত কাব্য-কায়া।
বিজ্ঞান ও ধর্মও পরস্পর তোমার মধ্যে—
যেহেতু তনুতে তোমার সুনিপুণ ছন্দের গ্রন্থন,
জ্যামিতিক রেখার্চনায়—গাণিতিক সংস্থাপনায়।

যেহেতু তুমি আত্মরতি-তৃপ্তসুখ অনন্যমনা,
—মননের সুউচ্চ চূড়ায় স্থির-ধ্রুবময়ী।
সুসংবদ্ধ মার্জিত আচরণ, অনবদ্য তোমার ব্যবহার,
কারণ তুমি নিরাসক্ত, নির্বিকল্প এক রূপের আধার।

নিরপেক্ষ তুমি কারো নও, কেউ নয় তোমার,
তথাপি সবাই আছে তোমারি মধ্যে এবং
তোমার চারিপাশে, যেমন গ্রহমণ্ডল ঘিরে থাকে,
প্রদীপ্ত সূর্যকে,—তেমনি উজ্জ্বল এক মধ্যমণি তুমি—
সত্য, ন্যায়, নৈতিকতার অপার প্রতীক,
সর্বোত্তম ভাব-গৌরবিণী।

নিরন্তর শৈশব তোমার মধ্যে—অথচ প্রজ্ঞাপারমিতা,
কখনো কমনীয়া নারী—কখনো পুরুষ-সমান।
মানস-সরোবরের অনুপম পদ্ম-বৈদগ্ধ—
জ্যোতির্ময় বলয়—সভ্যতার তিল তিল তিলোত্তমা ;
অতুলন সুষমার বিমূর্তনে তোমার দেহ-সত্তার
মানুষের কৃষ্টির ঐশ্বর্য—প্রতিভার দিব্য-অঙ্গনা,—
চির-যৌবনা।

তবু তো হায় তোমাকে দেখি দুর্জনের ছলে,
সেবিকা হও স্বৈরিণী—সাধিকা গণ-নায়কের
শক্তিমানের বিলাস-ভবনের তুচ্ছ মনোরঞ্জিনী।
তখন মূল্যহীনা তুমি তাদের পৃথুল হাতে
বর্বর লাঞ্ছিতা, এক নিরুপায় রমণী।
সেই শোকে ক্রোধোন্মত্তা, ভয়ঙ্করী নারী—
তোমার নিদারুণ দাপে কাঁপে অসংখ্য জনমানস,
তীক্ষ্ণ হাহাকার ধ্বনিতে, দীর্ণ কোলাহলে
সে যন্ত্রণার জ্বালা তোমাকে অহরহ পোড়াতে ব্যস্ত,
-- আর তুমি বঙ্কিম কৌতুকে হাস,—নিষ্ঠুর অধরা।

আমাকে জানতে দাও, কোথায় মিলাবো তোমাকে,
—সহৃদয় রত্ন-সিংহাসনে—অথবা পাতালের পাঁকে।

সিমেণ্ট বাঁধানো মসৃণ কার্পেটে

কালো কেরোসিনের স্রোতে আঁধার নেমে এলো,
ডুবে গেল দিনের শরীর অতলতার তলে,
সূর্যের শিখা দপ্ দপ্ জ্বলে,—নিভে যায়
আলো,—ধূমল কালির বিষাক্ত নিশ্বাসে।

রাত্রি হাসে,—মানুষের ষড়যন্ত্র প্রকৃতির সাথে।
পূর্ত-জরীপের দল,—ভয়ঙ্কর, অজগর কিংবা
শ্বাপদের চেয়ে,—কারণ ওদের ছলাকলা,
ধূর্ত নদীর মতো,—চতুর কারচুপি যতো,
রাতের আঁধারে, অসতর্ক পাড়ের বিরুদ্ধে।
যখন শীতল হাওয়ারা সমবেত সোনালী সুর তোলে,
আর জলের ছল্ছলানি আনে শিথিল-সম্মোহন
নিথর পাড়ের বুকে সেই মুহূর্তে হানে, বাঁধ ভাঙা
প্রবল ফেনিল আবর্তন,—নিদারুণ সংঘাত,
যতক্ষণ না কালো হাত টেনে নামায়
তাদের অন্ধ গর্তের গভীরে,—সমাধিস্থ মৃতদের
পাশে ; অথবা নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র সংসারীকে করে
সর্বস্বান্ত,—সামনে রসালো শর্ত,—স্বপ্নাতীত—
স্বর্ণ ভবিষ্যৎ—অগোচরে খুঁড়ে রাখে ফাঁদ,
তারপর বিষাক্ত আস্বাদ।

'হেড-লাইটের' আলো জ্বলে, নীলাম্বরী নক্ষত্রের তলে।
দুর্জ্ঞেয় গ্রহযান হতে আনা সংকেতবহ রহস্য নিশানা,
গুপ্তচরী রাত অর্থ জানে তার—বার্তার উত্তর দেয় বাতাসে,
যন্ত্রযান ছুটে চলে উর্ধ্বশ্বাসে, পাণ্ডুর পথ
সিমেণ্ট বাঁধানো মসৃণ কার্পেটে।

কী এক আসন্ন-সংবাদে, নিশ্চুপ কান পাতে
প্রকৃতি,—কখনো প্রলাপিত গম্ভীর মন্ত্রণায়
দীর্ঘশ্বাস ছড়ায়, আর ফেরে দূর পশ্চাতে।
সরে যায়, সরে যায়, চলে যায় জনপদ ছেড়ে,
তাদের সমাজ, সংসার, শান্তির নীড়গুলি নিয়ে ;
হাসি, অশ্রু, সুখ, দুঃখ বাসনা বিজড়িত, পুষ্পিত
সজ্জার আড়ালে যে জগৎ রহস্যময়—তাকে
আজ রহস্যতম মনে হয়—যদিও আমাদের
প্রতিবেশী, ভিন্ন ধর্মে, ভিন্ন কর্মে, ভিন্ন অবয়বে।
তবু আছে এক সেতু, নাড়ীতে নাড়ীতে বাঁধা যার
তার,—ধমনীতে শিরার গ্রন্থিতে—আর আত্মার
আত্মাতে—যার কাছে মানুষের দেনা শোধে আজো
ঋণ,—কারণ এখানেই তো শৈশবের দুর্যোগের
দিন, মানুষের জন্মান্তরে বেজেছিল, অন্য এক ইন্দ্রিয়ের গানে,
অলৌকিক সুরে, যুগ যুগান্তরে।

আজো তো মানুষের সাধ, প্রার্থনা, ভিক্ষা মাগে,
এক কণা সুষমা আর শান্তির প্রসাদ।
তারা ছেড়ে চলে যায়, চলে যেতে হয়—দূরে
বহুদূরে এবং হয়তো তারা যাবেই একদিন,
থাকবে না কেউ, আমাদের পথে,—শুধু এক
পথ ছাড়া—একক, নিঃসঙ্গ, দীর্ঘ ধূলিধূসর
সিমেন্ট বাঁধানো মসৃণ কার্পেটে।

আমার কুড়েমি

আমার কুড়েমি—
যেন কুণ্ডলিত অজগর সাপ,
নিজের শরীরের পাকে, নিজেকে জড়ায়,
—শুধু আত্মমগ্ন চেতনাটুকু
স্পর্শকাতরতায়—রচে এক
স্বপ্নময়—বোধি-সমন্বয়।

আমার কুড়েমি যেন
অবাধ নদী,—নিজেকে ছড়ায়,
মনে মনে হাসে, খেলে, ভাঙে দুই পাড়,
—গড়ে আবার—যার দুই তটে,
কেবলি রুপোলিকণা,
যা লক্ষবার কুড়োলেও, আমি ফুরোব না।

এক ভাষাহীন ভাষা,
যেন ভর করে কুড়েমিতে ;
আস্বাদ তার এক স্বাদহীন রঙ।
বিচিত্রিত এলোমেলো বর্ণ-সমাবেশে,
দেখেছি বরং—পেয়েছি প্রমাণ
—সূর্যের ভিতরে, এক সূর্য-সমান।

কুড়েমির সময় কোন
অপঠিত-পুঁথি, না-খোলা-পাতা
অথবা পতিত-প্রান্তর,—

অপেক্ষমাণ লাঙলের উদ্যত-'ফলা'র,
যেখানে ঝিকিমিকি সোনা ঝরে,
ফসলের দিগন্ত জোড়া
মাড়ায়ের ঘরে।

না,—আমার কুড়েমি এক
ভবিষ্য-সঞ্চয়,
গতির বেগ সংহত, খরধার পাখার আড়ালে।
বাজ কিংবা ঈগলের ডানার বার্তা,
বলে এক দুঃসাহস সমুদ্র যাত্রার।
প্রতিটি পেশী ইস্পাত-সুকঠিন,
মসৃণ, সুকুমার পালকে ঢাকা,
প্রতিটি মুহূর্ত যেন
শানিত কামনার, ইচ্ছার ধার।

সেই তো উপহার

সময় যদি অশ্বের মতো দ্রুতগামী
তবে তার মুখের বল্গা দৃঢ় মুষ্টি ধরো,
সামনে আনত দেহে আনো
বিদ্যুতের ভার।

সময় যদি উদ্ভিন্ন যৌবনা নারী
তবে দুই জানুতে ঢালো সতেজ-তারুণ্য,
দুই হাত পেশী-সমৃদ্ধ করো।

ভয়ঙ্কর কালের দৈত্য লৌহ পেষণে
নিষ্পেষিত করে তোমাকে,
তবে বিষের শায়কে বিদ্ধ করো তাকে,
ধরাশায়ী করো জেদের কবলে।

কিন্তু যদি সমতল ক্ষেত,
সময় রূপে আবির্ভূতা—নতজানু,
তবে প্রতিটি মুহূর্তে—সৃষ্টির আনন্দে
সার্থক করো তাকে—করো উর্বরা!
ক্ষেত্র প্রস্তুত, পরে বীজ বপন,
অঙ্কুর ও চারার জন্ম—নিগূঢ় রহস্য;
আর ভালোবাসার জলসিঞ্চনে
সফলতার শস্য,
সে তো জীবনের অনুভূত-সত্য
সর্ব-সুখ-সার,
মৃত্যুতে পবিত্র স্মৃতি, মানব জন্মের
সেই তো সান্ত্বনা—সেই তো উপহার।

অনেক কাল পরে

তোমারে দেহের গন্ধ বনহরিণীর মতো
উড়িয়ে আনলো কোন মল্লিকা-মালতী-ভেজা
বাতাসের সজল রুমাল।
কোষে কোষে পরিশ্রান্ত ঘাম—
চিকণ রেশ্‌মী আঁশে জড়িয়ে এসেছে
ঝরা কদমের কতো রোমাঞ্চিত রেণু।

তোমার চোখের পারে দীঘল কালোদামের
ঘন-সন্নিবেশ,
যাতে বৃষ্টির আঁচল-ধোয়া জল
দূর অবকাশ আকাশকে কাছে ডাকে।
চেতনার নীলকণ্ঠ-পাখির পাখাতে
উড়ন্ত আলোরা
লোফালুফি করে নানা ইন্দ্রধনু ফুল।

মেখেছ দেহের বর্ণে গোলাপজামের
স্বাস্থ্য-শীতলতা।
চোখে বিখ্যাত জ্যোছনার জ্যামিতিক রেখা
যুগল অর্ধ-বৃত্তের সঙ্গম-সেতুটি যেন
'তুমি-আমি' স্থাপত্যের স্মারক-নক্‌শা।
অথবা পিরামিডের তৃপ্তিকর ত্রি-কোণ পরিমিত—
তার স্থির দ্যুতিনীল অতল ঘনত্বে,
আশ্চর্য সরল সেই সূর্যের প্রতিফলন।

ঝিনুকের মতো ছুটি ঠোঁটের ভিতরে
সাদা প্লাস্টিকে যেন বিদ্যুতের ধার।
বাহুর গোপন পাশে গোলাপের মুগ্ধ-তন্ময়তা
যেন না-দেখা তন্বীর বিশিষ্ট প্রতীকী অনুভূতি।
কিন্তু তোমার মনের ব্যবহার পারদের মতো,
ভালবাসার উত্তাপে উঠা পড়া করে।
আর শরীরটা যেন—
থার্মোমিটারের এক উজ্জ্বল ঝলক—
সেখানে স্বচ্ছ বিন্যাসে পড়তে পারি প্রতিটি রেখা,
বিশ্বস্ত সে আঁকিবুকি বা সহজ ইচ্ছার উচ্চারণ।

বন্ধু, তুমি চিরদিন এখানে অক্ষত থাক
আমার ব্যক্তি-প্রেমের তুমিই তো যথার্থ নিরিখ।
উঁচু গম্বুজ-চূড়োয় প্রহরী ঘড়ির মতো,
তোমার সজাগ দৃষ্টি যেন
সর্বদা আমাকে বেঁধে রাখে—
সময়ের চিরকালীন অবিচ্ছিন্নতায়।

ঘুম তোমার

ঘুম তোমার গাঢ়তম হোক প্রিয়তমা
এই নিবিড়, তিমির, প্রসুপ্ত-প্রতিবেশে।
যেমন ঘনিত মেঘ ঢেকে দেয় প্রিয় সূর্যকে
অবলুপ্ত সত্তার গভীর তলদেশে
তেমনি তোমার নিদ্রা আচ্ছন্ন করুক
প্রগাঢ় শীতলতায়, সুনীল নিশ্বাসে।
তুমি শীর্ণ নদীর মতো সকরুণ কোমল
এই পার্থিব আধারে ধৃত অপার্থিব দ্যুতি।
তোমার কুঞ্চিত অলকগুচ্ছ—দুই দিকে
মাঝখানে উজ্জ্বল বাসনা-হত দীপ্ত মুখচ্ছবি
যেন পাহাড়ের মধ্য-তটে স্বচ্ছ নির্ঝরিণী,
স্বয়ং সেই ভালোবাসা ;—কিংবা নির্জনে খোঁজে—
ব্যাকুল কামনা-মগ্ন,—হেম-স্বপ্ন-কণা,
আলোছায়া ঝিকিমিকি পাথরের 'পরে।
প্রিয়তমা—ঘুমাও তুমি, তোমারি তো পাশে
জাগি আমি দীর্ঘায়ত ঐ অরণ্যের মতো
মাথা উঁচু করে প্রদীপ্ত প্রহরায়—আর
তুমি শ্যামল ঘাসের মতো প্রান্তরে বিলীন
চিকণ, সুচারু, মসৃণ ভালোবাসায় নত—
আমার হৃদয়ের কাছে, দেহের গোচরে।
অদূরে নীরবে বাজে কালের ঘণ্টাধ্বনি
নিঃসীম আকাশের পটে,—শুধু তুমি, আমি
পাশাপাশি, অনন্য মুখ নৈঃশব্দের ধ্যানে।
স্তব্ধ চরাচর—জাগি আমি,
ঘুমাও, ঘুমাও তুমি প্রিয়তমা—
একান্ত নির্ভর।

ক্যামিলিয়ন

আমি প্রথম তাকে দেখলাম ছোট্ট একটা টিলার উপরে,
তখন কমলা রঙের অপরাহ্ণ সূর্যের চাদরে তাকে ঢেকে দিয়েছে।
তার সারা শরীর ঝল্‌মলিয়ে উঠ্‌লো আর সংলগ্ন জলাভূমির
জরদ রঙ কাঁচ তীব্র হাসিতে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়লো।
ওদিকে তার জ্বল্‌ জ্বলে চোখের কোণে বেদনার নদী যেন ফুঁপিয়ে
উঠেছে ; তাতে মমতার ফেনা মাখানো—এমনভাবে ঢেউয়ের
মাথায় দুল্‌ছে যেন সে আমাকেই কাছে কাছে ডাকছে। নির্জনতার
সুনিপুণ অবসর ইঙ্গিতে আমি ভাঙা পায়ে এগিয়ে গেলাম,
সে-ও খাড়া পথে উপত্যকায় নামলো। এবড়ো খেবড়ো
চড়াই-উৎরাই মাঠের মধ্য দিয়ে যেন রঙিলা একটা
কমলালেবু গড়িয়ে গেল। সামনের হাল্কা বনের মধ্যে
সে তখন প্রবেশ করেছে—আর আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে তার পিছনে পিছনে।
ঘামে ভিজে গেছে শতছিন্ন গেঞ্জি, লম্বা লম্বা চুল বাঁশঝাড়ের মতো
চোখের উপরে ঝাপটা মারছে। জুতো জোড়াটা যেন সতের সারি
নৌকো হয়ে ভেসে যেতে চায় পায়ের নোঙর খুলে ফেলে—
বার বেলায় এ কোন চিত্রিণী হাতছানি দেয়। নিজেকে বড়
পরিশ্রান্ত মনে হয়। তথাপি পাহাড় পা দুটি টেনে চলি,
প্রতিজ্ঞা আমার পেতেই হবে তাকে।

ওকে দেখ্‌ছি কাঁটাগুল্মের মধ্যে সবুজ ঝোপঝাড়ের পাশে পাশে
ধানী রঙের বাহারি শাড়ি পরে, প্রজাপতির মধ্যে প্রজাপতি হয়ে,
যেন উড়ে চলেছে—শাল, পিয়াল, পাইন, দেবদারু, শিরিশ
পলাশের গা ঘেসে ঘেসে, আলতো ছুঁয়ে ছুঁয়ে অথচ অব্যর্থ
নিজেকে বাঁচিয়ে, কখনো এঁকে বেঁকে পালাচ্ছে সোনালী সরু
নদীর মতো পথ কেটে কেটে। ক্রমাগত বর্ণ বৈভবের অস্থির দ্যুতি
ছড়াতে ছড়াতে চলেছে ছলনাময়ী।

তারপর সহসা এক প্রশস্ত প্রান্তর জেগে উঠ্‌লো আশ্চর্য
দ্বীপের মতো। এত নিঃসঙ্গ যেন পরিত্যক্ত এক কবরখানার
বুকে রুগ্ন ফড়িংয়ের কান্না, যেন বর্ষার মধ্যরাত্রে ব্যাঙের
তীক্ষ্ণ ডাক। সে এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক গর্তের কিনারে—
একটা ছায়ার কায়া তির্যক থির্ থির্ কাঁপছে। এমন সময়ে
সূর্যটা বনের ওপারে টুপ করে ডুব দিল, আর শক্ত দু'হাত
বাড়িয়ে যেন তাকে তুলে নিয়ে গেল। কালো ভালুকের
রোমশ অন্ধকার ঝোপের আড়াল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।
মৃতের শূন্য সেই বিষণ্ণ প্রান্তরে ভূতে ধরা রোগীর মতন
আমি দাঁড়িয়ে আছি সেইখানে, যেখানে তাকে শেষ
দেখেছিলাম। মুঠোতে আমার কুড়িয়ে পাওয়া এক
অভাবনীয় উপহার, ফেলে যাওয়া ধ্যস্ত স্মৃতির আবর্জনা।

তখনো বাতাস ছড়াচ্ছে পরিচিত বুনো-ফুলের বাসি
শরীরের ঘ্রাণ। অন্ধকারের নখর রক্তাক্ত করছে আমাকে,
আমার সত্তার ঘর্মাক্ত বেদনাকে। ঘরে ফেরা পাখিরা
শেষবার কোলাহলের বিদ্রূপে সমস্ত প্রান্তর
ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

প্রলয় যখন এসেছিল

বিশফুট উঁচু বাঁশগাছের উস্কুখুস্কু জটার চূড়ায়
সেই শিশু তখনো দোল খায়, সকালের হাওয়ায় হাওয়ায়—
যেন সুতো-কাটা ফেঁসে যাওয়া ভিজে ঘুড়িটা
লট্‌কে আছে।
কে তুলে দিল ওকে ঐ আশ্চর্য স্কাইস্ক্র্যাপার
মৃত্যুর কাছে।
কোন মা'র এতো সাধ হলো শিশুটিকে শূন্যে ঝোলাবার,
যে ছিল তার শরীরের স্বাদ আর রক্তের স্নেহ-উপহার।
ফোলা ফোলা নিষ্পলক খোলা চোখ মেলে
কাকে দেখে গভীর নিবেশে, অনন্ত আকাশের শেষে ;
ঐ স্থির চোখের পাতা কোনদিন নেমে আসবেনা জেনে,
যতো ভয় আর বিস্ময় করে গেছে দৃষ্টির দৃঢ় নির্ণয়
বড় ভালোবেসে।
শকুনির লোলুপ বাসনা ঘুরে গেছে কিছু দূরে দূরে,
—তাই দলিত মাংসের স্তূপ অনাঘ্রাত রেখে,
সঁপে গেছে আগামী কালকে ;

আর সেই সরল মাংসস্নপিণ্ড হয়তো বা ভাবছে তখনো,
শুয়ে আছে মার কোলে কোমলতা জুড়ে, ওম্ ওম্
বুকের পালকে ;
তেমনি প্রগাঢ় প্রেমে আঁকড়ে ধরেছে, ম্লান পাঁশুটে পাতার
মরা বাঁশঝাড়।
অথবা হয়তো ভাবছে আর কতোটুকু উঁচুতে উঠে গেলে,
নাগাল পাবে 'এ্যাপোলো-সেভেনের' স্বরঞ্জিত ডানা।
দূর নাক্ষত্রিক আকাশের পথে পথে উড়ে চলে
মানুষের কীর্তির নিশানা,—প্রকৃতিকে বন্দী রেখে

খোঁজে আরো দূর পরীর ঠিকানা : যদিও সেই প্রকৃতির
প্লাবনিক রোষ অম্লান হেসে, মায়ের পাঁজর ছিঁড়ে
সেই শিশুকে নিয়ে চলে গেছে ভৌতিক দেশে।

২

'আমাকে তুমি ছেড়ে যেও না গো'
—বুকের কাছে ঘনিয়ে ওঠে কান্না।
জলস্রোত অন্ধকারের নীচে
হাজারো হাতে জড়িয়ে ধরে টানে।
পায়ের তলে একটু কি নাই মাটি!
গলার উপর ঠাণ্ডা কঠিন হাত
মৃত্যু হাঁকে—শমন আছে সঙ্গে।

আমাকে তুমি ছেড়ে যেও না গো
—অন্ধকারের মেঝেতে যেন ভাঙা
কাঁচের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে কাঁদে—
মৃত্যু শুনে খল্‌খলিয়ে হাসে।

দু'হাতে তার ভারী দেহটাকে
এবার আমি দিয়েছি জলে ঠেলে—
বোবাস্বরে আর ফোটে না ভাষা,
শুধু বুদ্‌বুদ্‌ গান গায়—মিলায় ক্রমে দূরে।

আমি তখন গাছের শাখাশ্রয়ে
নিরাপত্তার শয্যায় দিয়েছি ঢেলে
আমার শরীর—আমার প্রিয়তম।

শুধু রক্তের ভেতর নাছোড় কান্নাটা,
থেকে থেকে চেঁচিয়ে ওঠে জোরে,
—আমাকে তুমি ছেড়ে যেও না গো।

নদীর পাড়ে পাড়ে পাগলীটা ঘোরে—শীর্ণ ছায়া দোলে,—
'কোথায় আমার মাণিক, ফিরে আয় ফিরে, আয় কোলে।'
নির্লজ্জ নদী পাশ কাটে, চুপচাপ আড়ে আড়ে চায়,
রাক্ষসী সব কিছু জানে,—তবু দেবে না উত্তর—রাত বয়ে যায়।
হাওয়ারা হা—হা করে কাঁদে, বালিতে চাঁদের ভেজা চোখ,
দূরের সাক্ষী, বনস্থলী অস্থির ডানা ঝাড়ে,
খসে পড়ে নীলাভ পালক।
হাওয়ারা হা—হা করে কাঁদে, রাক্ষসী তিস্তা দক্ষিণে চলে,
নদীর পাড়ে পাড়ে পাগলীটা ঘোরে—শীর্ণ ছায়া দোলে,—
'কোথায় আমার মাণিক, ফিরে আয়, ফিরে আয় কোলে।'

ভয়ের ভীষণ কালো হাত

নামহীন নির্জনতার আকাশ হতে
ভরা আঁধারে, গহন বনে নামে
ভয়ের ভীষণ কালো হাত,—
শাখায় শাখায় আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ে
পাখার ঝাপট জাগে।

আধখানা হাত কনুই থেকে ঝোলে,
শূন্যে দোলে,—দৃশ্যমান তীক্ষ্ণ নখ—
রোমশ কঠিন মুঠির তলে।

একটি মুণ্ড—মাঝখানে তার গভীর গর্ত,
দু'ধারে দু'টি শ্বা-দন্ত—উদ্যত-স্থির।
দৃষ্টি বিহীন ঘোলা চোখ,—
বোবা—বধির—অসাড় ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

শীতল হাত—মরার মতো চিম্‌সে্‌ গন্ধ
বুকে বয়ে হন্যে হয়ে কাকে যেন খোঁজে
ঘোরে সারারাত।

নামহীন নির্জনতার আকাশ হতে
ভরা আঁধারে গহন বনে নামে
ভয়ের ভীষণ কালো হাত।

বিনিময়ে বৈভব দাও

আমি রমণীর রমণীয় দেহ সম্ভার থেকে
একটি একটি করে রত্ন নিলাম,
ঐশ্বর্য, সম্পদ যা' কিছু ছিল,—সর্বস্ব লোপাট করে,
বিজয়ীর উল্লাসে বেরিয়ে এলাম।
তথাপি কী জানি নিজেকে মনে হয় পরাজিত।
পাত্র পূর্ণ হলো না কেন—প্রশ্নে সংশয়।
আমার অহংকার ব্যক্তিত্ব বল, কিসে প্রতারিত,—
বুভুক্ষু কুকুরের মতো তা'রা —চলে পিছে পিছে।
মিথ্যেই দম্ভ দেখাই, অবসাদে ভরে যায় বুক,
ফিরে আসি পুনরায় দ্বারে,
—ডেকে বলি তারে—কী লুকিয়েছ বলো,
—যা' অমূল্য সঞ্চয় ?
ফিরে নাও সবখানি যা'কিছু খোয়া গেছে
দস্যুতার দারুণ কবলে—বিনিময়ে বৈভব দাও,
—যা আছে এখনো গুপ্ত একান্ত তোমারি।

সহসা নারী হাসে লাঞ্ছনার তিমিরে দাঁড়িয়ে,
দু'চোখের গোপন দু'টি মুক্তাবিন্দু জ্বলে ওঠে,

সকালের শঙ্খচূর্ণ শিশির কণায় গড়িয়ে গড়িয়ে,
রামধনু বর্ণালি আলো গলে গলে পড়ে।
বিস্মিত বোবা দুই হাতে তুলে ধরি আপ্লুত কপোল,
চুম্বনে চুম্বনে মুছে নেই তপ্ত জলকণা।
আমার আত্মার নিঃসীম আকাশের বুকে
স্তর স্তর ঘনমেঘ পার হয়ে হিরন্ময় পাখির
আবির্ভাব হলো—আহত ডানা দুটি যার ঢাকা
প্রেমের পালকে।

তবু কবি

শূন্য প্রান্তরে যেন স্তব্ধ অশ্বত্থ গাছ
দূরের কাছের সবকে করে অস্বীকার—
মগ্ন থাকে দূরাগত মেঘ-সঞ্চারে।
কিংবা 'রেডার' যন্ত্র যেন নৈঃশব্দের হাতে
সঞ্চয়ে অস্থির কোন বিশ্বস্ত বার্তা,
বাতাসের অলিতে গলিতে ; সমস্ত ইন্দ্রিয়
উজার—অনুভব-রসায়নে-চুর,—বিকল বোধলীন
অ-অপ্রস্তুত অস্তিত্বে আতুর—যদিও নিষ্ক্রিয়
পূর্বাপর ঘটনার স্রোতে—স্বাতন্ত্রে সে
সকলের ত্যাজ্য—সমদর্শী-আলিঙ্গনে-অচ্ছুৎ,
—তবু কবি,—সেই-ই একমাত্র কালের অগ্রদূত।

দার্শনিক

গাভীদের বৃন্দাবন নেই ;
যেই বনে, যেই পথে, তাদের পদপাত
সেই স্থান বৃন্দাবন হয়ে যায়।

মহাপুরুষের কোন দেশ-সীমা নাই
মহাবিশ্বই তাঁর গৃহের প্রাঙ্গণ।

শিশুদের নাই কোন দেবতা,
যেখানে তাদের অধিষ্ঠান,
সেই স্থান স্বর্ণময় দেবের মন্দির।
এদের প্রত্যেকের আছে এক
সত্যের-সংকেত।
যে প্রেমের-সংকেত বুঝে নিতে
আমাদের যুগ-যুগান্তর কেটে যায়।

যেহেতু জৈব-রীতিতে আমরা
পরিমাপ করি—দৈব-রীতির।

আলোর হরিণ গেছে মরে

কিশোর সবুজ কিশলয়, আরণ্যক তৃণ, কস্তুরী হরিণ,
লক্ষ্মী-পেঁচার রেশম-সাদা শরীর ও দূর সমুদ্রের শাঁখ,
স্মরণে এলে রবীন্দ্রনাথ, তোমার মৌন মূক ছায়ার কায়া
স্তব্ধ পুকুরের জলে ছবি এঁকে চলে ; এ কোন অদ্ভুত মিল
আশ্চর্য ছন্দমে কথা বলে ঃ জন্মলগ্নে সংগ্রহ করেছ বুঝি
প্রকৃতির বুক থেকে শ্রেষ্ঠ নির্যাস ; যদিও অভিন্ন ছিলে অবয়বে
আমাদের ভিড়ে, তবু তুমি অসামান্য এক অলোক সুন্দর
সৃষ্টি-চিহ্ন এনেছ সত্তার সাথে—দেখেছি তোমাতে শুভ-লক্ষ্মী
পেঁচার মংগল প্রতীকতা, চোখে চির কিশলয় কোমলতা,
দৃষ্টিপাতে আরণ্যক তৃণ, কম্প্র-কণ্ঠে সমুদ্র শঙ্খের ডাক,
আর অস্থির আর্তিতে ছুঁয়ে গেছ প্রাণ, মৃগমদের আঘ্রাণ,
তেমনি অশান্ত দিশেহারা, বিশ্বের ভাব-কস্তুরী বুকে বয়ে।

তুমি সূর্যের মতো উজ্জ্বল জ্বলে জ্বলে পৃথিবীতে পুড়িয়েছ
পাপ, তাই বলে আমাদের সামর্থ্যের নাগালে কখনো নও,
বরং খণ্ডিত আলোক-ধারে, ছোট ছোট ঘুলঘুলির আধারে,
তোমাকে পেয়েছি চেনা ধরে—সেই গাঢ়তম প্রকৃতির স্বরে।
সেই আমাদের সার্থকতা, কারণ সমগ্র সূর্য যদি চাই
সে হৃদয়-জোড়া ঘর কোথা পাই,—এই তো ভালো তোমার সঙ্গ,
ছোঁয়া, কালি ও কলমে, কিছু বাচনিক—উষার আলোতে, রোদে,
ছায়ায় যেমন ঝিরিঝিরি বৈশাখী বর্ষণে জাগায় ঘাসের
বুকে তীব্র রোমাঞ্চের স্বাদ—তেমনি নিয়েছি তুলে
নৈসর্গিক-আস্বাদ।

যখন তুমি হারিয়ে গেছ, পৃথিবীর মায়া পথ ধরে ধরে,
মাড়িয়ে মাড়িয়ে, ছাড়িয়েছ শেষ নক্ষত্র-সীমানা,—হারিয়েছি

আমি তোমাকে,—তোমার সাথে রোদ, বৃষ্টি, কচি-কিশলয়, আর
আরণ্যক তৃণের আকাঙ্ক্ষা, কস্তুরী-মৃগের ঘ্রাণ, সামুদ্রিক
শঙ্খের ডাক,—এ জীবনের পরম চিহ্ন-ক্ষণ, লক্ষ্মী-পেঁচার
শুভ-লক্ষণ।

আমার ঘরের চারপাশে আজ অজস্র আগাছারা ছেয়ে আছে
কাল পেঁচাদের কোলাহলে রাত জেগে আছে ;
আলোর হরিণ গেছে মরে, অন্ধকার শৃগালের ঘরে
করি আমি বাস।

খাঁ খাঁ…দুপুরের রোদ

খাঁ খাঁ উদাসীন দুপুরের রোদ
শূন্য প্রান্তর—দিগন্তে চিলের কালো ছোপ,
শ্মশানের নিঃস্বনিত কুণ্ডলিত ধোঁয়া,
রুক্ষ গাছের সার,
থেকে থেকে শকুনির কামার্ত চিৎকার।
উলঙ্গ মাটির শরীরে পিঁপড়েরা
সারবন্দী ঘোরে,
কেঁচোগুলো লাল কৃমি
কিলিবিলি করে।
ঝিঁ-ঝিঁদের মরা কান্না
স্তম্ভিত নৈঃশব্দের আড়ালে,
কাকের প্রলাপ—অর্বাচীন কথকতা
আজগুবী বৃক্ষের ডালে।

রোদের পারদে আলোকের জাল পাতা ;
ছায়াদের শরীরের রেখা যেন
ইতস্তত: ঘূর্ণিত উড়ন্ত বাদুরের ঝাঁকে।

যে জীবন করেছে ধাওয়া,—
পলায়মান—জরাজীর্ণ
জাফ্‌রির ফাঁকে।
শূন্য হাত—জড়ায় জটিল জাল, ফের
ছুঁড়ে দেয় আপ্রাণ ওপাড়ের মোড়ে ;
ঘর্মাক্ত খুঁটির গায়ে বাঁধা
বাসনার দড়ি—কাৎরে ওঠে
কঠিন মোচড়ে।

প্রজাপতি ক্রমাগত পাক খায়,
ডানা খসে পড়ে,
ফুল নেই, রস নেই, বিবর্ণ বিস্বাদ ঃ
জীবন পেতে চায়, অথচ
চলে যায় উড়ে—সরু সরু
রোদের ফোকরে।
—খাঁ খাঁ দুপুরের রোদ
শূন্য প্রান্তরে।

শিল্প [বিশ্বজনীন]

১ বিভঙ্গ ডিমের গর্ভে নিস্তরঙ্গ আলোকের সন্ত ভাঙা ঘুম
বুকে তার জায়মান জ্যোতির্ময় রক্তরাগ পঙ্কজ কুসুম।

২ দেখ, তপতীর প্রকাশ্য শরীর
ক্রমে ঘনীভূত, পরিপূর্ণ নগ্নতার গাঢ় আবরণে।
ধীরে হিমানী দ্রবণ, জ্যোছনার তন্তুজ তন্নুচ্ছদে
—ছায়া অন্তরালে।

—অথচ স্ফটিক-স্বচ্ছ—দৃশ্যমান তন্নুরুচি
যেন গুচ্ছ গুচ্ছ গন্ধবহ রজনীগন্ধার ঝাড়
—ঢালে উষ্ণ সুরা ইন্দ্রিয়-চাতালে।

৩ বয়স্থা বাঁকা চাঁদ—
ভাঙা মেঘের জানালার ধারে
একাকী মুখ ঢাকে কুয়াশার
মলিন আঁচলে। শীত জর্জর ঘরে
নির্জন শয্যাতে, ক্ষীণ-যৌবনার
ব্যর্থ রাত কাটে।

৪ টুক্‌টুকে লাল আগুনের ফুল
মোমের মতো সিগারেটের মুখে,
—আহা, যেন জ্বলন্ত লিপ্‌স্‌টিক্
রূপালী ইলিসের মতো মসৃণ
সাদা আঁশে গড়া সুন্দরীর ঠোঁটে।

৫ 'শুক্‌নো মরা গাছে বন-ময়ূরী নাচে'
—দেখ্‌রে উদর-দাম্ভিকের বুকে—ফুটে আছে কবিতার ফুল।

৬ কৃষ্ণ-চূড়ার কপোলে
গোপনে রঙ মাখালে—কে ?
—ওপাশে সূর্য ছোঁড়াটা
হো, হো, করে হাসে।

৭ কোথায় সহসা উচ্চরোল কোকিলের বোলবোলা
আকাশ সমুদ্রে ভেসে এলো ;
—ভেঁপু বাজিয়ে জাহাজ ভেড়ে বন্দরে,—
সঙ্গে বসন্তের সুবিপুল পণ্য-সম্ভার।

৮ বিষণ্ণ হলুদে পাতাদের ভিড়ে
সহসা এক কিশোর পাখি
গান গেয়ে ওঠে ; ঠোঁটে তার
আরণ্যক ধার।
ম্লান চৈতালী পাতার বুকে বাজে করতালি
সাজায় সে বসন্তের রিক্ত
শেষ রক্ত-ডালি।

৯ মেঘলা ঢল, চোখের জল
ফেলছে রূপের গরবিনী,
মাঠ ভরেছে, ঘাট ভরেছে,
ভরে না ঘড়া বিরহিণীর।

১০ সাঁঝের বাতাসে বোনা
বিষাদের পাটি,
তোমার স্মৃতির নকৃশা
রেখেছে ধরে।

১১ কালোজামের থোকায় থোকায়
কোঁকড়া চুলের ঝাড়।
কোন্ কিশোরী স্নান সেরেছে
জল ঝেড়েছে—আর,
কাকচক্ষু দীঘির ঘাটের বাঁধানো আয়নায়,
রোদ্দুরেতে পিঠ রেখে, মুখ দেখছে তার।

১২ নীল আকাশের কাঁচপাত্রে
তরল সূর্য পেয়ালা ছাপায়
শারদ ঘাসের কোমল গালিচায়।

১৩ রাতের স্ফটিক-স্তন হতে ঝরে পড়ে
আলোর ঝরনা,
আর অন্ধকার তৃষিত বালক যেন
জড়ায় দু'হাতে
সে অমৃতের আস্বাদ ভরে।

শিল্প [ভারতীয়]

১ শিশু দেবতার বুকের পাঁজর
যেন ভাঙা দেশ্‌লাইয়ের বাক্‌স,
আর শরীরটা যেন ঘসা-কাঠি।
বারুদের শীর্ণ মুখ ভিজে গেছে
অজস্র অশ্রু আর ঘামে।
আলোর উত্তাপে শক্ত হবে বলে,
বসে আছে খর রৌদ্রের উনানে।

২ আতপ্ত রাজপথের শূন্য মরুচরে
বিপণিতে স্তরে স্তরে রসালো ফল-সম্ভার ;
অনাহারীর হরিণ-চোখের করুণ প্রতিভাসে,
মরীচিকা নির্ঝরের চূর্ণ জল ঝরে।

মহৎ শিল্পী

গোলাপ-তরু কী করে একই সঙ্গে আছ ধরে,
কাঁটার কলঙ্ক আর স্বর্গীয় পবিত্র সুষমা ?

কবিতা

সে এক সুতীব্র আবেগ
বীর্য-বহ্নির বিস্ফোরণ—
আকাশ চৌচির ; মনের সমতলে ফুলঝুরি
ফোটায় ফুল—সোনালী জলের সমতুল,
আর তার ছায়াটুকু চিরন্তন
ধরে রাখতে চায়—ঘাসের দর্পণে।

এই হাতে

এই হাতে যতো কথা লিখেছি তোমাকে
যতো ভাষা করে গেছি দান,
সময়ের অফুরান নির্জন বাগানে,
যদি সে কথার বীজ নষ্ট হয় ভ্রষ্ট-কীটের
দাঁতে—জাগে না উদ্দাম চারা,
বসন্তে কি শীতে ঃ
যদি সে ভাষার শরীর গোধূলির আলেয়ার মতো,
ক্ষণিক গোলাপী হয়ে মুছে যায় সন্ধ্যার আঁধারে,

তবে আমার সান্ত্বনার হাত যেন পায় খুঁজে
লাঙলের ফাল—দীর্ণ করে অনুর্বর মাটি
সরস ফসল আনে শ্রমে আর ঘামে ঃ
অন্তত একটি শস্য কণিকার রসে, একটি মানব তনু

স্বাস্থ্য পায় ফিরে—কর্মের বধির উল্লাসে
জাগে বিভাবনা—প্রাণময় ধমনীর কোষে,
তবে তার পূর্বজের আশীর্বাদ পেতে
সে কখনো ব্যর্থ হবে না,
শোধ হবে জন্মের ঋণ, রক্তের দেনা।

—শেষ—